মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (রঃ)ঃ জীবন ও কর্ম

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল বাকী

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

M.Phil.

গবেষক

মোঃ জসিম উদ্দিন

এম, ফিল, ২য় বর্ষ

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RB
B
920
JAM

এম. ফিল, ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

২০০২ ইং

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র:)ঃ জীবন ও কর্ম

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ মুহাম্মদ আবদুল বাকী
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka
Bangladesh

গবেষক
মোঃ জসিম উদ্দিন
এম. ফিল. ২য় বর্ষ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

২০০৩ ইং

Dhaka University Institutional Repository

সূচী

		ভূমিকা ঃ	২
অধ্যায় ১	ঃ	মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (রঃ) –এর জন্মের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা	৫
অধ্যায় ২	ঃ	জীবন বৃত্তান্ত	২২
		(ক) জন্ম ও বংশ পরিচয়	২২
		(খ) শিক্ষা ও ইসলাম গ্রহণ	২২
অধ্যায় ৩	ঃ	কর্মজীবন	২৯
		(ক) গোঠপীরঝান্ডায় দারুল ইরশাদ প্রতিষ্ঠা	২৯
		(খ) প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম	২৯
		(গ) কাবুলে হিজরত ও অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা	৪২
		(ঘ) রেশমী রুমাল আন্দোলন	৫৫
		(ঙ) আফগানিস্তান ত্যাগ এবং রাশিয়া, তুরস্ক ও মক্কায় গমন।	৭০
		(চ) ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন	৭৬
		(ছ) মৃত্যু	৮২
অধ্যায় ৪	ঃ	রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা	৮৩
অধ্যায় ৫	ঃ	ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা	৯৮
অধ্যায় ৬	ঃ	জীবনধারা	১০৯
		উপসংহার	১১২
		গ্রন্থপঞ্জী	১১৩

491330

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে রয়েছে দেশের দ্বীনদার 'আলিম, সূফীসাধক, রাজনীতিক, সমাজ সংস্কারক ও বুদ্ধিজীবীগণের গর্বিত অংশগ্রহণ। আযাদী সংগ্রামের সূচনা এবং প্রত্যক্ষ মুক্তিসংগ্রামে রয়েছে তাঁদের বলিষ্ঠ ভূমিকা। স্বভাবতই তাঁদের প্রতি রয়েছে জাতির সচেতন জনগোষ্ঠীর গভীর মমত্ববোধ, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। এই আযাদী আন্দোলনের সংগ্রামী 'আলিমগণের জীবনেতিহাস জানার আগ্রহ- আকাংখা ছোটকাল থেকেই । ছাত্র জীবনে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত (১৯৮৪ খৃঃ) মওলানা মুজীবুর রহমান অনূদিত ও সংকলিত "মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর রোজনামচা" শীর্ষক গ্রন্থটি হাতে পেয়ে মাওলানা সিন্ধীর আত্মজীবনী পাঠ করে এই ক্ষণজন্মা মুসলিম মনীষীর জীবনেতিহাস সর্ম্পকে বিস্তারিত জানার ব্যাপক কৌতূহল ও আগ্রহের জন্ম হয়। মাওলানা সিন্ধীর জীবনীর উপর উর্দূ ভাষায় রচিত কিছু বই- পুস্তক পাওয়া গেলেও বাংলা ভাষায় তাঁর জীবনীর উপর কোন বই–পুস্তক তখন পাচ্ছিলাম না । তাই মনে মনে ইচ্ছাপোষণ করলাম, আগামী দিনে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর জীবনী নিয়ে গবেষেণা করব। সে ইচ্ছার প্রেক্ষিতেই এম. ফিল. কোর্স -এ ভর্তির সময় " মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র:) ঃ জীবন ও কর্ম " শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র জমা দিলাম । কিন্তু আবেদনপত্র জমা দেয়ার প্রাক্কালে জানতে পারলাম, ঠিক একই শিরোনামে একটি পুস্তক রচনা করেছেন বিজ্ঞজন , পন্ডিত, গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ ও ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ । তাঁর বইটি হাতে পাবার পর অনেকটা দুঃশ্চিন্তায় পড়লাম ! এমন একজন পন্ডিত মনীষী যেখানে মাওলানা সিন্ধীর জীবন ও কর্মের উপর বই লিখেছেন, সেখানে এই নবীনের জন্য নতুন কিছু আবিস্কার করার বিষয়টি হয়ত একটি দুঃসাধ্য বিষয়ে পরিণত হবে! তবে ডঃ আব্দুল্লাহর বইটি পাঠ করে এবং মাওলানা সিন্ধীর জীবনী প্রসংগে বিভিন্ন বই -পুস্তক ঘাটাঘাটি করে দেখলাম, মাওলানা সিন্ধীর জীবন ও কর্ম আলোচনা ও গবেষণায় আরো এমন অনেক নতুন নতুন তথ্যের সংযোজন প্রয়োজন, যা মাওলানা সিন্ধী সংম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য একান্ত জরুরী । তাই দীর্ঘদিনের ইচ্ছাকে না দমিয়ে; বরং সিদ্ধান্তে অটল থেকে এ বিষয়ে গবেষণাকর্ম শুরু করলাম। তবে একথাও বলতে হবে যে, ডঃ আব্দুল্লাহ স্যারের বইটি আমার গবেষণার পথ অনেকটা সুগম করেছে।

এই গবেষণাকর্মের জন্য যেসব মৌলিক গ্রন্থের একান্তই প্রয়োজন ছিল, যে গুলো ছাড়া আমি নিজেও পরিতৃপ্ত নই, এমন বেশ কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করতে দু'বছর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। তাই তথ্যের অভাব আমি ধাপে ধাপে ও পদে পদে অনুভব করেছি। অবশেষে আমার গবেষণাকর্মে প্রত্যক্ষ ও প্রধান অবলম্বন হলঃ শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) রচিত " নকশ্ -এ হায়াত " ২য় খন্ড ও "সফর নামা-ই আসীরে মাল্টা",'আব্দুর রশীদ আরশাদ রচিত " বীস বড়ে মুসলমান", মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র:) রচিত "শাহ ওয়ালী উল্লাহ আওর উনকি সিয়াসী তাহরীক", মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী রচিত "মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী আওর উনকে নাকিদ", মুহাম্মদ সারওয়ার রচিত

Dhaka University Institutional Repository

"খুতুবাত-এ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী", সায়্যিদ মাহবুব রিযবী রচিত "তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ", সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ রচিত "আসীরানে মাল্টা", "দৈনিক জমী'অত" দিল্লী, ২৬ মার্চ ১৯৮০ খৃঃ দারুল উলূম দেওবন্দ শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা এবং ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ রচিত "মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীঃ জীবন ও কর্ম " ইত্যাদি গ্রন্থরাজী। আমার এ গবেষণাকর্মের প্রথম ও প্রধান উৎস ছিল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, মালিবাগ মাদ্রাসার কুতুবখানা, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভকে আমি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছিঃ অধ্যায় ১. মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র.)- এর জন্মের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা, অধ্যায় ২. জীবন বৃত্তান্ত, অধ্যায় ৩. কর্ম জীবন, অধ্যায় ৪. রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা, অধ্যায় ৫. ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা, অধ্যায় ৬ . জীবনধারা এবং সবশেষে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জী।

এ গবেষণাকর্মে আমাকে সবচেযে বেশী যিনি সহযোগিতা করেছেন, তিনি ছিলেন আমার দিক নিদের্শক, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আবদুল বাকী স্যার । তিনি আমার জন্য যে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন , সময়- অসময়ে আমার বিরক্তকে অসামান্য মমতা দিয়ে সহ্য করেছেন, বই- পুস্তক দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এবং উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছেন; এর কোন তুলনা হয় না। তাঁর এ ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারব না। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ ও ফার্সী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে বাধিত করেছেন। তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ । আমার সহধর্মিনী নানানভাবে যে সহযোগিতা যুগিয়েছেন, তা তাবৎকাল স্মরণযোগ্য। এছাড়া মোহাম্মদ তাহাজ্জত হোসেন কম্পিউটার কম্পোজ করতে আমার জন্য যে দীর্ঘ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সে জন্য তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ছিলেন, সত্যানুসন্ধানী ও জাগ্রত বিবেকের অধিকারী একজন মেধাবী নওমুসলিম। ন্যায়নিষ্ঠ বিবেকের তাড়নায় তিনি শিখধর্ম ত্যাগ করে সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং নওমুসলিম সত্ত্বেও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন । তিনি ছাত্রজীবনে দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়তে এসে শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসানের সংস্পর্শ ও ছোঁয়া পেয়ে জিহাদী মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতের বাইরে মুজাহিদগণের আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল ইয়াগীস্তান । পরবর্তীতে তা স্থানান্তর করা হয় কাবুলে । শায়খুল হিন্দ কাবুল কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মাওলানা সিন্ধীকে সেখানে পাঠান। মাওলানা সিন্ধী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাবুল গমন করেন এবং সেখানে সাত বছর অবস্থান করে ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ শাসন উৎখাতের কৌশল ও কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে, তিনি হতোদ্যম না হয়ে; বরং কাবুল ত্যাগ করে প্রথমে মক্কোতে সাত মাস অবস্থান করে সেখানকার

Dhaka University Institutional Repository

সমাজবিপ্লব প্রত্যক্ষ করেন, আর সে আলোকে স্বদেশে সমাজ সংস্কার ও ইসলামী সমাজবাদ প্রর্বতনে সংকল্পবদ্ধ হন। এর পর আংকারায় তিন বছর অবস্থান করে কামাল পাশার ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন। অতঃপর বার বছর মক্কায় অবস্থান করে জ্ঞানসাধনা করেন। বিশেষ করে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) (১৭০৩-১৭৬২খৃ:)-এর দর্শন ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করেন। নির্বাসিন জীবন শেষে দেশে ফিরে নিজস্ব চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেন। সে উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দল গঠন করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমী স্থাপন করেন, বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করেন এবং সভা-সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন।

সিন্ধীর জীবনার্দশ, রাজনৈতিক চিন্তা ও ধর্মীয় ভাবনা নিয়ে পরস্পর বিরোধী অভিমত রয়েছে । কর্মজীবনের গোড়ার দিকে তিনি ধর্ম ও রাষ্ট্রকে দু'টো স্বতন্ত্র বিষয় মনে করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করতে হিন্দু-মুসলিমের যুক্ত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে "ভারতীয় জাতীয়তাবাদ" প্লাটফর্মের মাধ্যমে দু'টো জাতির মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সে কারণেই তিনি ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত "পাকিস্তান আন্দোলন"- এর বিরোধী ছিলেন । তবে কংগ্রেস হিন্দু - মুসলিমের প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়েছিল বিধায়, কংগ্রেসের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল কম। মাওলানা সিন্ধী ধর্মের সঙ্গে প্রগতিশীলতার সমন্বয় ঘটাতে ধর্ম ও জীবনকে এক করে দেখেছিলেন । দুনিয়া ও আখিরাতের সমন্বয়ে একটি জীবনবোধ মুসলমানদের সামনে পেশ করেছিলেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে সাংগঠনিক তৎপরতা চালালেও জীবনের শেষ দিকে সে নীতিতে সক্রিয় থাকেননি । তৎকালীন বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, মুসলিম বিশ্বের প্রায় সবদেশের সাথে ভারতবর্ষের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকায় এবং সামরিক সাহায্য নিয়ে ভারতের পাশে দাঁড়াবে; এমন কেউ না থাকার কারণে, তিনি শেষ জীবনে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করেন । তাঁর "জাতী ডায়েরী" বা আত্মজীবনী এবং "রেশমী রুমালপত্র" ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনন্য দলীল হিসেবে গণ্য।

সুতরাং বর্তমান অভিসন্দর্ভে বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী মরদে মুজাহিদ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর জীবন ও কর্মকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এর দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের কিছু অনালোচিত অধ্যায় জানার অবকাশ হবে এবং আমাদের ইতিহাস -ঐতিহ্যকে জানতে সহায়তা করবে ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ডিসেম্বর ২০০৩ ইং

মোঃ জসিম উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ১

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র:)- এর জন্মের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

১৪৯৮ খৃস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কোদ্যাগামা ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কারের পর থেকেই ইউরোপীয়দের সাথে ভারতবর্ষের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ভাস্কোদ্যাগামার ভারতবর্ষে আগমনের পর থেকে প্রায় একশ' বছর পর্তুগীজরা ভারতের সাথে একচেটিয়া বাণিজ্য করে আসলেও ১৬০০খৃ: ইংরেজ বণিকরা "ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী" ১৬০২ খৃ: হল্যান্ডদেশীয় ওলন্দাজ বা ডাচগণ " ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী", ১৬১৬ খৃ: ডেনর্মাকের অধিবাসী দিনেমারগণ " দিনেমার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী" এবং ১৬৬৪ খৃ: ফ্রান্সের বণিকগোষ্ঠী "ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী " প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আগমন করে। কালক্রমে ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ইংরেজ বণিকরা ব্যতীত আর সবাই ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যায়। শুধু মাত্র পর্তুগীজরা ভারতের পশ্চিম উপকূল দামন ও দিউতে সীমিত আকারে ব্যবসা করতে থাকে[১]।

১৬১২ খৃ: ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আগমনের পর মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে (১৬০৫-১৬২৭খৃ:) সূরাট ও আহমদাবাদ এলাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুযোগ লাভ করে এবং সম্রাট শাহ্জাহানের শাসনামলে (১৬২৭-১৬৫৮খৃ:) এই সুবিধা আরো ব্যাপকভাবে লাভ করে । কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৬৫৮-১৭০৭খৃ:) ইংরেজদের অবাধ ব্যবসা–বাণিজ্যে শংকিত হয়ে তাতে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। আঞ্চলিক শাসকরা সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে মেতে ওঠেন। স্পেনের ন্যায় ভারতের মুসলিম রাজপরিবারগুলো আত্মকলহে লিপ্ত হয়। পশ্চিমে শিখ শক্তি এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে মারাঠাগণ বিলীয়মান মুঘল সাম্রাজ্যে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে উদ্যত হয়। তখন ভারতের এই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার সুযোগে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসার অন্তরালে রাজত্ব বিস্তারের সুযোগ গ্রহণ করে। ইংরেজরা তখন হিন্দুদেরকে মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে এবং মুসলিম শাসকদের পরিবারে

---

১. আব্দুল জলীল, এ, এম, এম, " দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ " , ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ: ৬৬ ; মাহমুদুল হাসান, সৈয়দ, ডঃ, "ভারতবর্ষের ইতিহাস " , গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, ঢাকা , ১৯৮৯, পৃ: ৪৫৪-৪৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

ভয়াবহ ইন্ধন যুগিয়ে মুসলিম শাসকদের শক্তি দূর্বল করে দেয়[১]। ইংরেজ ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে সংঘটিত হয় ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধ। যুদ্ধে কোম্পানীর কাছে নবাব সিরাজের পতনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় এবং ইংরেজদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে[২]। সাথে সাথে শুরু হয় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন, শোষণ, জুলুম, অত্যাচার, অনাচার ও দমননীতি। পলাশী যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর মুসলমানদের রাজনৈতিক সংকট শুরু হয়[৩]। উল্লেখ্য, ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসেছিল নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের উদ্দেশ্যে। কোন আর্দশের পয়গাম নিয়ে ভারতবর্ষে আসেনি। এসেছিল, বাণিজ্য বিস্তার ও অর্থ উর্পাজনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ভারতীয় রাজন্যবর্গের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কূটকৌশলে ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা দখল করে দীর্ঘ একশ'নব্বই বছর (১৭৫৭-১৯৪৭ খৃঃ) ভারত শাসন করে। এর মধ্যে একশ' বছর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং নব্বই বছর (১৮৫৭- ১৯৪৭ খৃঃ) সরাসরি বৃটিশ সরকার শাসন করে [৪]।

ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী ইংরেজদের করতলে যাবার আগেই অর্থাৎ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে আগমনের পর থেকেই সমকালীন মুসলিম চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, ধর্মীয় নেতা ও আলিমগণ মুসলিম শাসকদেরকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতা দখল করার পর 'আলিমগণ সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন । তাঁরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেন । সে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন ১৯৪৭ এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করা পর্যন্ত [৫]।

সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) দ্বীনে এলাহী ও অন্যান্য ইসলাম বিধ্বংসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে পরিচালিত হযরত শায়খ আহমদ সেরহিন্দীর[৬] (র.)(১৫৬৩-১৬২৪ খৃঃ) সংস্কার আন্দোলন

---

১. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, "বীস বড়ে মুসলমান", ৯ম সংস্করণ, মাকতবা-ই রশীদিয়া, লাহোর, ১৯৯৯, পৃঃ যাল; আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬-৬৭; মাহমূদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫৪-৪৫৮।

২. ইনাম-উল- হক, মুহাম্মদ, ডঃ, "ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ২।

৩. মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫৭।

৪. রহিম, এম, এ, "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস", আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ১২-১৩।

৫. হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা,সায়্যিদ, "নকশ্ -এ হায়াত", ২য় খন্ড, মাকতবা -এ দ্বীনিয়াহ, দেওবন্দ, ১৯৫৩, পৃঃ ৩২; আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩।

৬. **শায়খ আহমদ সেরহিন্দী ঃ** শায়খ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদ-ই- আলফেসানী (র.) (১৫৬৩-১৬২৪ খৃঃ) ৯৭৫ হিঃ/ ১৫৬৩ খৃঃ পাঞ্জাবের তৎকালীন পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত বিখ্যাত সেরহিন্দ শহরে জন্মগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে তাঁরই উত্তরসূরী হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ[১] (র.) (১৭০৩-১৭৬২খৃ:) পরিচালনা করেন। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুসলিম মিল্লাতকে এক বিপদ সংকুল পরিস্থিতি থেকে রক্ষার

করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা শেখ আব্দুল আহাদ (র.)। শায়খ আহমদ পবিত্র কুরআন হিফজ করার পর পাঠোপযোগী কিতাবসমূহ পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন। এরপর শিয়ালকোট ও কাশ্মীরে গমন করেন এবং মুল্লা কামাল উদ্দীন কাশ্মীরী (মৃ: ১০১৭হি:) ও শায়খ ইয়াকুব সরফীর (মৃ: ১০০০ হি:) নিকট থেকে হাদীস, তাফসীর ও মান্তিক- হিকমত বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন শ্রেষ্টতম পীর বাকীবিল্লাহ (র.)-এর হাতে বায়'য়াত গ্রহণ করেন। শরী'অত ও মা'রিফত সম্পর্কে অগাধ পান্ডিত্য অর্জনের পর তিনি অধ্যাপনায় মনযোগী হন। কিন্তু ভারতবর্ষের তৎকালীন মুসলিম নামধারী সম্রাটগণ যখন ইসলামকে ধ্বংস সাধনে লিপ্ত এবং অজ্ঞতা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে সারাদেশ আচ্ছন্ন এবং দরবারী আলিমরা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত, আলিম ও পীর সাহেবরা মাদ্রাসা শিক্ষা ও খানকায় পীর মুরীদী নিয়ে মশগুল; তখন এই মহান সংস্কারক শায়খ আহমদ গর্জে ওঠেন। তিনি সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন এবং সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের ইসলাম বিধ্বংসী কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করতে যেয়ে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হন। বন্দি অবস্থায় ও তিনি সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে যান। তাঁর সংস্কার আন্দোলন ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে যেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল অদ্রূপ ভারতবর্ষের আলিম সমাজের মধ্যেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই মনীষী ১৬২৪ খৃ: ইন্তিকাল করেন। (রুহুল আমীন, মোহাম্মদ, "মুজাদ্দিদ -ই - আলফেসানীর সংস্কার আন্দোলন", ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ: ৭-৯।)

১. **শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র.)**ঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) ছিলেন জগৎ বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ,দার্শনিক, মুজাদ্দিদ , যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম, মুজতাহিদ, গ্রন্থপ্রণেতা ও সমাজ সংস্কারক । মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের ইন্তিকালের চার বছর পূর্বে দিল্লী থেকে ত্রিশ মাইল পশ্চিমে রহতক নামক স্থানে ১৪ শাওয়াল ১১১৪হি:/ ১৭০৩ খৃ: জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবুল ফয়েজ শাহ আব্দুর রহীম। পাঁচ বছর বয়সে পিতার নিকট লেখা-পড়া আরম্ভ করেন। সাত বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন। দশ বছরে "শরহে মুল্লা" পর্যন্ত কিতাবসমূহ পাঠ করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এতটা উন্নতি লাভ করেন যে, তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, উসূল, মানতিক, আকায়িদ, তাসাউফ, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, জ্যামিতি ও চিকিৎসা বিষয়ে অতি অল্প দিনেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১১৪৩ হিজরীতে তিনি মক্কায় গমন করে সেখানে যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও আধ্যাত্মিক মনীষী শায়খ আবু তাহির মাদানী (র.) (মৃ:১৭৩৩খৃ:), শায়খ ওকাদুল্লাহ মক্কী এবং শায়খ ওমর ইব্ন আহমদ মক্কী প্রমুখ যুগ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে সিহাহ্ সিত্তাহসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর পিতা তাঁকে বিয়ে দেন। সতের বছর বয়সে পিতার নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন। ১৭৩৩খৃ: তিনি হারামাইন হতে স্বদেশে ফিরে এসে দিল্লীতে তাঁর পিতার রহীমিয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন এবং একাধারে ত্রিশ বছরব্যাপী কুরআন ও হাদীস শিক্ষাদান ও সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিশেষ করে ভারতবর্ষের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

নিমিত্ত শায়খ আহমদ সেরহিন্দীর সংস্কার আন্দোলন জোরালোভাবে পরিচালনা করেন। তিনি শির্ক্, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লিখনী ধারন করেন। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীতে এমন এক সময় জন্মগ্রহণ করেন, যখন মুঘল সাম্রাজ্য অবক্ষয় ও পতনের মুখে নিপতিত হয়েছিল। দিল্লীতে তখন মুসলিম রাজত্বের প্রাণটুকু অবশিষ্ট ছিল মাত্র [১]। মক্কাতে তখন তাঁর সমসাময়িক নেতা মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল ওয়াহহাব[২] পূর্ব আরবের নজদে ১৭০৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তখনকার ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে অবস্থিত উসমানী তুর্কী সাম্রাজ্য ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে রাজনৈতিক পতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল ওয়াহ্হাব বহু দেশ ভ্রমণ করে মুসলমানদের পতন ও দুরবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ধর্মীয় সমাজ সংস্কারে ব্রতীহন। তিনি মুসলমানদেরকে পীরপূজা, কবরপূজা, শির্ক্ , বিদ'আত কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত ও মুক্ত করতে ব্রতীহন। কুরআন–হাদীসের আলোকে পরিচালিত তাঁর এ সংস্কার বা নবজাগরণ ইতিহাসে "মুহাম্মদী আন্দোলন" নামে খ্যাত[৩]। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল ওয়াহ্হাবের ন্যায় ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের সামাজিক অবক্ষয়

অধঃপতন দেখে গভীরভাবে মর্মাহত হন। মক্কায় অবস্থানকালে নজদের মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল ওয়াহহাব-এর সংস্পর্শ পেয়ে তাঁর মধ্যেও সমাজ সংস্কারের প্রেরণা জাগ্রত হয়। তিনি ব্যাপকভাবে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৭৬২ খৃ: তিনি ইন্তিকাল করেন। এমন একজন প্রতিভাবান পন্ডিত মনীষীর আগমন দুনিয়াতে অনেক কম হয়েছে। ছোট বড় অসংখ্য কিতাব রচনা করে তিনি ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছেন। ("হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা", ১ম খন্ড, (উর্দূ সংস্করণ) ইসলামী একাডেমী, উর্দূবাজার, লাহোর,১৯৮৪, পৃ:ভূমিকা দ্রঃ।)

১. ইনাম –উল – হক, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯-১১।

২. **মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল ওয়াহ্হাবঃ** মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল ওয়াহ্হাব ছিলেন আঠার শতকের গোড়ার দিকে আরব এলাকার একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংস্কারক। এই মনীষী ১৭০৩ খৃ: আরবের "উয়াইনা" অঞ্চলে তামীম গোত্রের শাখা বনু সিনান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে হজ্ব করতে যেয়ে মক্কা–মদীনার মুসলমানদের অনৈসলামিক আচার - অনুষ্ঠান, কবরে নির্মিত বিরাট সৌধ এবং কবরকে কেন্দ্র করে রচিত ঈমান বিধ্বংসী শির্ক্ , কুফর ও পৌত্তলিকতা জাতীয় কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে জোরদার আওয়াজ তোলেন এবং দামেশ্ক শহর থেকে তাঁর সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। উসমানীয় তুর্কী শাসক শ্রেণীর ইসলাম বিরোধী আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হন। তিনি নজদ প্রদেশের দারিয়াহ অধিপতি মুহাম্মদ বিন সউদের নিকট স্বীয় কন্যাকে বিয়ে দিয়ে তাঁর সহযোগিতায় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। মুহাম্মদ বিন সউদ পরবর্তীকালে গোটা আরব তাঁর করতলগত করে সউদ বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন (১৩২৮খৃ:)। মুসলিম সমাজকে কুংস্কারমুক্ত করতে তাঁর রচিত "আত-তাওহীদ" গ্রন্থটি আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৭৯২খৃ: এই মনীষী ইন্তিকাল করেন। ('আব্দুল জলীল,প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৫-৮৬)

৩. ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪ ;'আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

ও রাজনৈতিক পতন রোধে বিশুদ্ধ শিক্ষা, বিশুদ্ধ ধর্মনীতি, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক সাধনা পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে এর মোকাবেলা করতে উদ্দোগী হন। একারণেই তাঁকে মুসলিম প্রাচ্যবিদ স্কলার ডঃ ফজলুর রহমান "থিংকার অব ক্রাইসিস" (সংকটের চিন্তানায়ক) রূপে অভিহিত করেন[১]। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুসলমানদেরকে আত্মশুদ্ধির পরামর্শ দেন । ক্ষয়িষ্ণু দুর্বল এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট মুঘল সম্রাটদের সংশোধনের চেষ্টা করেন এবং মুসলিম সাম্রাজ্য উদ্ধারের পরামর্শ দেন[২]। তিনি বলেন, "অস্ত্রধারণ করে ভারতের মুসলমানদের সংস্কার করার উপযুক্ত সময় যদি থাকত, তবে আমি অস্ত্র ধরতে ইতস্তত করতাম না[৩]"। মধ্যযুগ শেষ হয়েছে, এই উপলব্ধির দরুন তিনি অস্ত্রের পরিবর্তে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাবার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং জিহাদের মানসিকতা উজ্জীবিত রাখার উপদেশ দেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে বহু সংখ্যক গ্রন্থের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন [৪]।

ইমামুল হিন্দ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র.) যে সংস্কার পরিকল্পনা ও বিপ্লবী দর্শন প্রচার করেন, তা তাঁরই পুত্র ও শিষ্য সিরাজুলহিন্দ শাহ 'আব্দুল 'আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী[৫] (র.) (১৭৪৬-১৮২৩ খৃঃ)- এর দমনীতে সঞ্চারিত হয়। শাহ 'আব্দুল আযীয (র.) ১৮০৩ খৃঃ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দেন [৬]। সাম্রাজ্যবাদী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বড় লাট লর্ড ওয়েলেস্লী (১৭৯৮-১৮০৫খৃঃ) ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রাধান্য বিস্তার লক্ষ্যে অধীনতামূলক

---

১. "ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা", ঢাকা, ৪২ বর্ষ,২য় সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২), পৃঃ ১৬৪।

২. ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ নয়।

৩-৪. ঐ, পৃঃ ৮-৯।

৫. **শাহ 'আব্দুল 'আযীয (র.)**ঃ শাহ 'আব্দুল 'আযীয (র.) ছিলেন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১১৫৯ হিঃ/ ১৭৪৬খৃঃ দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫ বছর বয়সেই তাঁর পিতার ন্যায় হাদীসসহ যাবতীয় 'ইল্মে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং মাত্র সতের বছর বয়সে তাসাউফের সনদ লাভ করেন। হাদীস ও অন্যান্য 'ইল্ম পিতা শাহ ওয়ালী উল্লাহর নিকট থেকে অর্জন করেন। তাঁর পিতা তাঁকে স্বীয় সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দেন। পিতার ইন্তিকালের পর হাদীস ও তাসাউফ শিক্ষাদানে দিল্লীর রহীমিয়া মাদ্রাসায় পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং ষাট বছরব্যাপী এ সাধনা চালিয়ে যান। শাহ্ 'আব্দুল আযীয (র.) ৮১ বছর বয়সে ১২৩৯ হিঃ/১৮২৩ খৃঃ মৃত্যু বরণ করেন। ১৮০৩ খৃঃ তিনি বৃটিশের দাম্ভিক উচ্চারণের বিরুদ্ধে যে ফাতাওয়া ঘোষণা করেন, তা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সে আন্দোলনের ঢেউ সারা ভারতে আছড়ে পড়ে। (নূর মোহাম্মদ আ'জমী (র.), মাওলানা, "হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস", ৪র্থ সংস্করণ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ১৫৭-১৫৮।

৬. 'আব্দুল 'আযীয, শাহ, "ফাতাওয়া আযীযিয়া", ১ম খন্ড, মাতবা'-এ মুজতবায়ী, দিল্লী, তাঃ বিঃ, পৃঃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

মিত্রতা সন্ধি প্রবর্তন করে তা মহীশূরের বীর সুলতান ফতেহ আলী টিপুকে (১৭৮২-১৭৯৯খৃঃ) গ্রহণ করার আমন্ত্রন জানালে, সুলতান টিপু সেই অপমানজনক সন্ধি প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ইংরেজদের সাথে তাঁর পুনরায় যুদ্ধ বাঁধে এবং চতুর্থ ইঙ্গ -মহীশূর যুদ্ধে শৌর্য - বীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। এর ফলে মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশই বৃটিশ শাসনভুক্ত হয়[১]। পক্ষান্তরে মারাঠা নেতা দ্বিতীয় বাজীরাও ১৮০২ খৃঃ সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীতে ভোঁসলা ও সিন্দিয়াও ওয়েলেস্লীর অধীনতামূলক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৭৯৯ খৃঃ তাঞ্জোরের রাজাকে কোম্পানী নিজেদের অধীন নিয়ে আসে এবং সুরাট রাজ্য জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। এভাবে ইংরেজরা ভারতের তিনটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তির পতন ঘটায়[২]। অতঃপর ইংরেজ কোম্পানী মুঘল সম্রাট শাহ আলমকে (১৭৫৯-১৮০৬ খৃঃ) মারাঠাদের কর্তৃত্বাধীন থেকে মুক্ত করে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে আসে এবং ১৮০৩ খৃঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে ভারতের শাসন ক্ষমতা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে ঘোষণা দেয়, "এখন থেকে আল্লাহর সৃষ্টজগতে বাদশাহ সালামতের রাজ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব চলতে থাকবে [৩]।" এই ঘোষণায় ভারতের মুসলমানরা বিক্ষুভে ফেটে পড়েন। কোম্পানীর এই দাম্ভিক উচ্চারণের প্রতিবাদ করে শাহ 'আব্দুল 'আযীয (র.) ১৮০৩ খৃঃ প্রত্যক্ষ মুক্তিসংগ্রামের ঘোষণা দেন। তিনি ভারতবর্ষকে "দারুল হরব্" অর্থাৎ বির্ধমী কবলিত দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন[৪] এবং ভারতবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আহবান জানান। তিনি বলেন, "যখন কোন কাফের গোষ্ঠী কোন মুসলিম দেশ অধিকার করার ফলে ইসলামী আইনসমূহ অকার্যকর হয়ে যায়, মুসলমানগণ নিরাপদে বাস করতে না পারেন এবং ধর্মকর্ম করতে বাধাগ্রস্থ হন; সেটি শত্রু কবলিত দেশে (দারুল হরব্) পরিণত হয়ে যায়"। শাহ্ 'আব্দুল 'আযীযের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মৌলবী 'আব্দুল হাই পরিস্কার ঘোষণা দিলেন," কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত আজ খৃষ্টান্দের রাজত্ব এবং হিন্দুস্তান সংলগ্ন অন্যান্য দেশসমূহও শত্রু কবলিত দেশ। এরা আমাদের পবিত্র ধর্ম ইসলামী আইনের পরোয়া করে না। তাই যখন কোন দেশে এমন অবস্থা বিরাজ করে, তখন সে দেশ দারুল হরব্ হয়ে যায়"[৫]। শাহ 'আব্দুল 'আযীযের এ ফাতাওয়া ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দাবানাল ছড়িয়ে দেয় এবং ভারতের জনগণের ঘুমন্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলে। ফলে ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ভারতীয় মুসলমানদের জানাতে এবং বুঝাতে সক্ষম হন যে, আমাদের আবশ্যকীয় কাজ হল, "বিদেশী অমুসলিমদের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করা"[৬]। শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয (র.) পরবর্তীতে তাঁর এই

১-২. মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩৭।

৩. আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।

৪. "নকশ্-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ৩-৪ ; আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭ ; 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ যাল।

৫. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ৩-৪।

৬. আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রাম ও আন্দোলন কর্মসূচী অব্যাহত রাখার জন্য তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ও খলীফা সায়্যিদ আমহদ শহীদ বেরেলবী [১] (র.)-এর হাতে অর্পণ করেন। তিনি সায়্যিদ আমহদকে মা'রিফতের জ্ঞান দান করেন এবং শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন।[২] শাহ্ 'আব্দুল 'আযীযের উপদেশ মতে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, ছাত্র ও শিষ্য শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ[৩] (১৭৮২-১৮৩১ খৃ:) এবং জামাতা মৌলবী 'আব্দুল হাই সায়্যিদ আহমদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন[৪]। এতে সায়্যিদ আহমদের দলে

---

১. **সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলবী (র.)**ঃ সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলবী (র.) ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক মনীষী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানী। সায়্যিদ আহমদ তদানীন্তন ভারতের অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত রায়বেরেলী সংলগ্ন তাকীয়া নামক স্থানে ১৭৮৬ খৃ: এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সায়্যিদ মুহাম্মদ 'ইরফান। ১৮০৬ খৃ: তিনি বিদ্যা ও শিষ্টাচার শিক্ষার উদ্দেশ্যে শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয (র.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তাঁকে শাহ 'আব্দুল কাদির-এর তত্ত্বাবধানে সোর্পদ করেন। তিনি তাঁকে কুরআন, হাদীস ও তাফসীর শিক্ষা দেন। ২২ বছর বয়সে সায়্যিদ আহমদ শাহ 'আব্দুল 'আযীযের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে খিলাফত লাভ করেন এবং ঐ বছরই (১৮০৮ খৃ:) তিনি জন্মস্থানে ফিরে যান। ১৮১০ খৃ: তিনি টংকের নবাব আমীর খানের অধীনে সিপাহীর চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৮১৩ খৃ: টংকের নবাব ইংরেজদের সাথে আপোষ করলে তিনি সিপাহীর চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দিল্লীতে তাঁর শায়খ শাহ্ 'আব্দুল 'আযীযের নিকট চলে আসেন। ১৮২০ খৃ: তিনি শাহ ইসমাঈল শহীদ ও শাহ 'আব্দুল কাদিরসহ প্রায় চারশ' শিষ্য নিয়ে হজ্ব পালন করেন। ১৮২৩ খৃ: মক্কা হতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েন। তখন থেকে ১৮৩১ খৃ: শাহাদত বরণ করা পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করেন। তাঁর সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল পাঞ্জাবের শিখ রাজা রনজিত সিংহের বিরুদ্ধে।("নকশ্-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ২৫-২৯;আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ:৭৬-৮১।)

২. ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ: নয়।

৩. **শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (র.)**ঃ শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (র.) ছিলেন শাহ্ 'আব্দুল গণীর একমাত্র পুত্র এবং শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর পৌত্র। বিদ্যাবত্তা, বাগ্মিতা, ধর্মীয় উপদেশ প্রচার, শিক্ষকতা, অধ্যাপনা এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের আলিমগণের মধ্যে তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। ১২ই রবিউচ্ছানী ১১৯৩ হি: / ২৯ এপ্রিল ১৭৭৯ খৃ: মুজাফ্ফরনগর জেলার ফুলাতে মামার বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পনের-ষোল বছর বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি সায়্যিদ আহমদ শহীদের হাতে আধ্যাত্মিক বায়'আত গ্রহণ করে ওয়াজ-বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য আহবান করতে থাকেন। সন্ত-রণবিদ্যা , সওয়ারী, তলোয়ারচালনা, নেযাহবাযী, শরীরচর্চা ও সমরকুশলতা সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি পাঞ্জাবের শিখ নেতা রনজিত সিংহের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদে সায়্যিদ আহমদের সাথে যোগদান করেন। অবশেষে ১৮৩১ খৃ: ৬মে রনজিত সিংহের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে সায়্যিদ আহমদ শহীদের সাথে শাহাদত বরণ করেন। তাঁর রচিত "তাকবিয়াতুল ঈমান" গ্রন্থটি তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। (আব্দুল মান্নান, সৈয়দ (অনূ), "মুজাহিদ বাহিনীর ইতিবৃত্ত" ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮,পৃ: ১১৩-১২৯ ; ইসমাঈল শহীদ, শাহ্, "তাকবিয়াতুল ঈমান", মাকতবাহ থানবী, দেওবন্দ, ১৯৮৪, পৃ: ৫-৮।)

৪. "নকশ্-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়। সায়্যিদ আহমদ নিজ এলাকা থেকে শুরু করে সারা ভারত পরিভ্রমণ করে লক্ষ লক্ষ সমর্থক ও শিষ্য সংগ্রহ করেন এবং তাদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুন ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। তাঁর এই বিশাল কর্মী বাহিনী শুধু মাত্র মুসলমানদের মধ্যে সীমিত ছিল না; বরং অনেক অমুসলিমও এতে অংশগ্রহণ করেন [১]। সায়্যিদ আহমদ বিদেশী রাজত্ব ও তাদের সৃষ্ট সব ধরনের জোর- যুল্‌ম, নির্যাতন, নিপীড়ন, দমন-পীড়ন ও সন্ত্রাস নির্মূলের শপথ নিলেন। তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে বিপ্লবের কাঠামো তৈরি করেন। তার বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সর্বহারা সংগ্রামে রূপ লাভ করে। সায়্যিদ আহমদ হিন্দু - মুসলিম সবাইকে জানিয়ে দিলেন, "তাঁর এই মুক্তিসংগ্রামের উদ্দেশ্য হল, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগ্রাসন ও জবরদখল থেকে দেশকে মুক্ত করা। অতঃপর কে ভারত শাসন করবে,এ নিয়ে তাঁর কোন মোহ ও আগ্রহ নেই ;বরং যারাই উপযুক্ত বিবেচিত হবেন, তারাই দেশ শাসন করবেন"[২]। সায়্যিদ আহমদ যখন বৃটিশের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, সে সময় পাঞ্জাবে শিখ মহারাজা রনজিত সিংহের রাজত্ব চলছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রাম মুকাবিলা করতে সম্মুখযুদ্ধে ভীত হয়ে কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র হিসেবে রনজিত সিংহকে ব্যবহার করে। সায়্যিদ আহমদ জানতে পারেন যে, মহারাজা রনজিত সিংহের শাসনাধীন মুসলমানগণ অকথ্য নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন । সেখানে প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মের অপমান করা হচ্ছে। সায়্যিদ আহমদ স্বীয় শাগরিদ শাহ্ ইসমাঈল শহীদকে এ ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পাঠালেন। শাহ্ ইসমাইল শহীদ সরেজমিনে এসব দৃশ্য দেখার পর রিপোর্ট পেশ করলে সায়্যিদ আহমদ তাঁর মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে পাঞ্জাবের দিকে যাত্রা করেন ১৮২৬ খৃ: ২১ ডিসেম্বর[৩]। তিনি সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায়। সায়্যিদ আহমদ নোওশেরা থেকে ৮ মাইল দূরে "আকোরা" নামক স্থানে শিখদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে তাঁর মুজাহিদ বাহিনী জয় লাভ করে। ১৮৩০ খৃ: জুন মাসে সায়্যিদ আহমদ পুনরায় মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে রনজিত সিংহের বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করে শিখ রাজ্যের পশ্চিম রাজধানী পেশওয়ার জয় করেন এবং সেখানে খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত নীতিতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন।সায়্যিদ আহমদ নির্বাচিত হলেন মুজাহিদগণের আমীরুল মু'মিনীন। তাঁরা রাজধানী স্থাপন করেন পাটনা শহরে [৪]। কিন্তু ধূর্ত

---

১. ঐ, পৃ: ১১-১২।

২-৩. "নকশ্- এ-হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১২-১৬।

৪. নূর -উদ- দীন আহমদ, (অনূ) "শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ", ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ: ৮৩ ; "সাপ্তাহিক পূর্ণিমা", ৭ম বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, (৯ মার্চ ১৯৯৪) ঢাকা, পৃ: ৩১ ; ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

শিখ ও ইংরেজ জাতি সম্মুখযুদ্ধে সায়্যিদ আহমদ শহীদের সাথে টিকতে না পেরে শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করে। সায়্যিদ আহমদের অনুগামীর ছদ্মাবরণে সীমান্তের মুনাফিক বিশ্বাস ঘাতক পাঠানদের মধ্যে পায়েন্দা খান ও নযফ খানের সহায়তায়[১] মনশেরার নিকটবর্তী বালাকোট নামক স্থানে ১৮৩১ খৃঃ মে মাসে রনজিত সিংহের সেনাপতি শেরসিংহ সায়্যিদ আহমদ ও শাহ্ ইসমাঈল শহীদের উপর অতর্কিত হামলা করে। ফলে মুজাহিদ বাহিনীর মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সায়্যিদ আহমদ ও শাহ্ ইসমাঈল শহীদ অল্প সংখ্যক অনুসারী নিয়ে শিখদের সাথে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন [২]। এভাবেই সায়্যিদ আহমদের স্বাধীনতা সংগ্রাম স্বদেশীয়দের হাতে রক্তে রঞ্জিত হয়।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) যখন সীমান্তে শিখদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন তাঁর এক শিষ্য চেতনার অগ্নিপুরুষ সায়্যিদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর [৩] বাংলাদেশে নিঃস্ব মুসলিম কৃষকদেরকে নিয়ে হিন্দু জমিদারদের উৎপীড়ন, নীলকুঠির অত্যাচারী সাহেব ও দালালদের নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য একটি সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে কৃষক ও তাঁতীদের রক্ষাকরার প্রয়াস পান[৪]। তিনি স্বাধীনভাবে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুরের কিয়দাংশে। তিতুমীর বৃটিশদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন বেশ কয়েকবার । অবশেষে ১৮৩১খৃঃ নারিকেল বাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লায় অবস্থান করে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন [৫]।

মুসলমানদের আরো একটি সংস্কার আন্দোলন যা পরবর্তীতে কৃষক-প্রজা বিদ্রোহের রূপ লাভ করেছিল, তা হল "ফরায়েজী আন্দোলন"। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হাজী শরীয়ত

---

১. ইনাম-উল- হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

২. ঐ, পৃঃ ২০ ; আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯-৮০ ; "নকশ্-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ২৯।

৩. **সায়্যিদ নিসার আলীঃ** সায়্যিদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর ১৭৮২ খৃঃ চব্বিশ পরগনার অর্ন্তগত চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। একজন সংগঠক, কুস্তিগীর ও সাহসী বীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৮১৯ খৃঃ তিনি হজ্ব আদায় করেন। সেখানে সায়্যিদ আহমদ শহীদের সাথে সাক্ষাত হলে তাঁর মতবাদ ও আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন। স্বদেশে ফিরে তিতুমীর অত্যাচারী হিন্দু জমিদার, অত্যাচারী নীল কুঠিওয়ালা ও বৃটিশ দালালদের বিরুদ্ধে স্বাধীকার আন্দোলনে ব্রতী হন। তিনি একাধিকবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন। অবশেষে ১৮৩১ খৃঃ নারিকেল বাড়িয়ার যুদ্ধে তাঁর বাশেঁর কেল্লা ইংরেজদের কামানে বিধ্বস্ত হলে তিনি যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। (মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬০-৫৬১; ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩-২৮।)

৪. গোলাম আহমাদ মোর্তজা, "চেপে রাখা ইতিহাস"৮ম সংস্করণ, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, বর্ধমান, ২০০০, পৃঃ ২১১-২১২।

৫. মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬০-৫৬১ ; ইনাম-উল -হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লাহ[১]। তিনি মুসলমানদেরকে শির্ক্-বিদ'আত থেকে দূরে রাখতে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি পীরপূজা, কবরপূজা ও অপারাপর অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আর্দশে সচেতন করে তুলেন এবং বৃটিশ রাজ, অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও অমিতাচারী সুবিধা ভোগকারীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ করেন[২]। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দীন [৩] ওরফে দুদু মিয়াঁ তাঁর অসমাপ্ত সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনিও মুসলমান কৃষকদেরকে অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও নীলকুঠির বর্বর ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অনুপ্রাণিত করেন[৪]। তাঁর আন্দোলন বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোর, ফরিদপুর, পাবনা, নদীয়া, ঢাকা, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, রংপুর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে[৫]। তিনি হিন্দু জমিদার ও নীলকর ইংরেজদের পরাজিত করে ১৮৫৭ খৃঃ পর্যন্ত আন্দোলন পরিচালনা করেন[৬]।

---

১. **হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ ঃ** ভারতবর্ষের ইতিহাসে সিংহপুরুষ বলে পরিচিত হাজী শরী'অত উল্লাহ ১৭৮১খৃঃ ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহ্কুমার অন্তর্গত শ্যামায়েল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আট বছর বয়সে তাঁর পিতা আব্দুল জলীল তালুকদার মারা যান। ধর্মীয় শিক্ষা লাভের পর হজ্ব পালন শেষে ১৮১৮ খৃঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সংস্কার আন্দোল পরিচালনা করেন। তিনি মুসলমানদেরকে শির্ক্-বিদ'আত, কুসংস্কার, কবরপূজা, পীরপূজা ও অন্যান্য অনৈসলামিক কার্যাবলী থেকে মুক্ত করে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শে সচেতন করেন। সাথে সাথে বৃটিশ রাজ, অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও অমিতাচারী সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ করেন। ১৮৪০খৃঃ তিনি নিজ গ্রামে মৃত্যু বরণ করেন।(অতুল চন্দ্র রায়, ডঃ, "ভারতের ইতিহাস", মৌলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা, ২০০১,পৃ:২৫৪; ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত,পৃ:৩১-৩৫)

২. ইনাম-উল -হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।

৩. **মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দীনঃ** মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দীন ওরফে দুদু মিঁয়া ছিলেন হাজী শরী'অত উল্লাহর পুত্র । ১৮১৯ খৃঃ তাঁর জন্ম। ধর্মীয় শিক্ষালাভ ও হজ্ব পালনের পর তিনি তিতুমীরের সাহচর্যে আসেন। দুদু মিঁয়া ফরায়েজী আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রুপান্তরিত করেন। তিনি মুসলমান কৃষকদেরকে অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও নীলকুঠির বর্বর ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারনে অনুপ্রাণিত করেন। হিন্দু জমিদার ও নীলকর সাহেবদের পরাজিত করে ১৮৪৭-৫৭ খৃঃ পর্যন্ত আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৮৫৭ এর আযাদী আন্দোলনের সময় তাঁকে কলিকাতার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি রাখা হয়। ১৮৬২ খৃঃ বন্দি অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ফরায়েজী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। (মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬০ ; অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪- ২৫৫।

৪. ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪-৩৭।

৫. মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬০।

৬. অতুল চন্দ্র রায়, "ভারতের ইতিহাস", মৌলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা, ২০০১, পৃঃ ২৫৪-২৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৩১ খৃঃ ৬ মে বালাকোটের যুদ্ধে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ, শাহ্ ইসমাঈল শহীদ ও অন্যান্য মুজাহিদগণের শাহাদাতের পর জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সায়্যিদ আহমদের দুই শিষ্য মাওলানা বিলায়াত আলী[১] ও মাওলানা ইনায়াত আলী[২]। তাঁদের নেতৃত্বে সারা ভারতে আবার বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং সশস্ত্র জিহাদের রূপ নেয়। দেশের সর্বত্র কৃষকরা জমিদার ও নীলকুটি ওয়ালাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। ১৮৫০খৃঃ ইংরেজ কোম্পানী সমগ্র পাঞ্জাব দখল করলে মুজাহিদগণের সমস্ত আক্রোশ আছড়ে পড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। শুরু হয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। তাঁরা সুযোগ বুঝেই ইংরেজদের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। বেনিয়া ইংরেজদের তাড়িয়ে এ দেশে আবারো ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে মুজাহিদ বাহিনীর সমস্ত কার্যক্রম অব্যাহতভাবে পরিচালিত হতে থাকে[৩]। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংঘটিত হয় ১৮৫৭'র স্বাধীনতা আন্দোলন। তখন হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজির-এ মক্কী [২] (র.)-এর নেতৃত্বে যুক্ত প্রদেশের

---

১. **মাওলানা বিলায়াত আলী ঃ** মাওলানা বিলায়াত আলীর পিতার নাম মওলবী ফতেহ আলী। ১২০৫ হিঃ/১৭৯০ খৃঃ তাঁর জন্ম । শাহ্ ইসমাঈল শহীদের নিকট তিনি লেখা-পড়া করেন।'ই বাদত ও তা'লীম ব্যতীত পুরো সময় সাথীদের খেদমত করে কাটাতেন। জংগল থেকে কাঠ কেটে আনতেন। নিজ হাতে খাদ্য পাকাতেন। তাঁর প্রচেষ্টায় তাঁর খানদানের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও আত্নীয়-স্বজন সায়্যিদ আহমদ শহীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। সায়্যিদ আহমদ যখন বালাকোটের যুদ্ধে লিপ্ত, তখন তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করছিলেন দক্ষিণ ভারতের হায়দারাবাদে। পিতার ইন্তিকাল ও সায়্যিদ আহমদের শাহাদতের পর তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। এ উদ্দেশ্য তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও এলাহাবাদ সফর করেন। সীমান্ত অঞ্চলে মুজাহিদ আন্দোলনের কার্যক্রমও পরিচালনা করেন। ১৮৫২ খৃঃ ৫ই নভেম্বর এই মনীষী ইন্তিকাল করেন। (আব্দুল মান্নান, সৈয়দ (অনূ), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪১, ২৪৮, ৩০৪।)

২. **মাওলানা ইনায়াত আলী ঃ** তিনি ছিলেন মাওলানা বিলায়াত আলীর ছোট ভাই। সায়্যিদ আহমদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করার পর তাঁর জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তিনি সায়্যিদ আহমদের সঙ্গে জিহাদের জন্য গমন করেন এবং সেখান থেকে তাবলীগের কাজে বাংলায় আগমন করেন। যশোর জেলার হাকিমপুর মৌজায় নিজের কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখানে হাজী নাসির উদ্দীন খান ও মদন খান তাঁর ভক্তে পরিণত হন। যশোর, নদীয়া, ফরিদপুর, রাজশাহী, মালদাহ ও বগুড়া ছিল তাঁর তাবলীগের কেন্দ্র। তাঁর মৃত্যুর তারিখ নিশ্চিতভাবে বলা যায়নি। তবে অনুমান, তিনি ১২৭৪ হিঃ ৬ ই শাবান / ১৮৫৮ খৃঃ ২২মার্চ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। (আব্দুল মান্নান, সৈয়দ (অনূ), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৮।)

৩. মোদ্দাব্বের, মোহাম্মদ,"ইতিহাস কথা কয়", ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা,১৯৮৭,পৃঃ১১৯-১২০।

৪. **হাজী ইমদাদ উল্লাহঃ** হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজির - এ মক্কী (র.) মুযাফ্ফর নগর জেলার থানাবন গ্রামে ১২৩৩ হিঃ/১৮১৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাফিজ মুহাম্মদ আমীন। তাঁর বংশসূত্র ফারুকী। একজন জমিদার পরিবারের সন্তান। শৈশবে তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ করেন এবং আরবী-ফার্সী

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামলী এলাকায় একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় [১]। সে যুদ্ধে মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী[২] (র.) ছিলেন সিপাহ্ সালার এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী [৩](র.) ছিলেন কাযীউলকুযাত।

কিতাবসমূহ মন্সী আব্দুর রায্যাক ও মুফতী ইলাহীবখশের নিকট পাঠ করেন। এরপর তাঁর আর নিয়মতান্ত্রিক লিখা-পড়ার সুযোগ হয়নি। তিনি ছিলেন ইল্মে লাদুন্নীর অধিকারী। কারণে, সবাই তাঁকে আলাদা মার্যাদা দিতেন । প্রথমে নকশেবন্দিয়া তরীকার পীর শাহ্ নাসির উদ্দীন দেহলবীর হাতে বায়'আত হন। তাঁর ইন্তিকালের পর চিশতিয়া তরীকার পীর মিয়াঁজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানবীর নিকট মুরীদ হয়ে খিলাফত লাভ করেন । ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনে তিনি বীর সেনানীর ভূমিকা পালন করেন। অতপর ১৮৫৯খৃ: ৪৩ বছর বয়সে মক্কায় গমন করেন এবং প্রায় ৪১ বছর সেখানে অবস্থান করেন। মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা খলীল আহমদ সাহারনপুরী, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ও শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী প্রমূখ তাঁর মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। ১৩১৭ হি: / ১৮৯৯ খৃ: তিনি ইন্তিকাল করেন। (আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ:৮০-১০০।)

১. আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ:৯৪-৯৫।

২. **মাওলানা মুহাম্মদ কাসিমঃ** মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী (র.) ১২৪৮ হি: / ১৮৩২ খৃ: সাহারনপুর জেলার নানূতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শায়খ আসাদ নানূতবী । আরবী ,ফারসী, ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ, মান্তিক, হিকমত প্রভৃতি বিষয় তিনি দিল্লীর মাওলানা মামলুক আলী নানূতবীর নিকট অধ্যয়ন করেন। হাদীসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন মাওলানা আব্দুল গণী মুজাদ্দিদীর নিকট। তবে বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করেন মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরীর নিকট।ইল্মে তাসাউফ লাভ করেন হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর নিকট। ১৮৫৭ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনি সিপাহসালার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে এক যুগ সন্ধিক্ষণে মাওলানা যুলফিকার আলী দেওবন্দী, মাওলানা ফযলুর রহমান দেওবন্দী ও শায়খ নেহাল আহমদ দেওবন্দীর সহায়তায় ১৮৬৭ খৃ: ৩০ মে বিশ্ব বিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১২৯৭ হি:/১৮৮০খৃ: ১৫ই এপ্রিল ইন্তিকাল করেন। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ: ২৭০-২৭১।)

৩. **মাওলানা রশীদ আহমদঃ** মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী (র.) ১২৪৪ হি: সাহারনপুর জেলার গাঙ্গূহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হিদায়াত উল্লাহ আনসারী। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে আরবী, ফার্সী, মান্তিক ও ফিক্হ তৎকালীন দিল্লী কলেজের অধ্যাপক মাওলানা মামলুফ আলী নানূতবীর (মৃ: ১৮৪৪ খৃ:) নিকট অধ্যয়ন করেন এবং শাহ্ আব্দুল গণী মুজাদ্দিদী ও শাহ্ আহমদ সাঈদ মুজাদ্দিদীর নিকট হাদীসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। হাজী ইমদাদ উল্লাহর নিকট থেকে আধ্যাত্মিক সবক লাভ করেন। ১৮৫৭ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং সে অপরাধে ছয়মাস কারাদন্ড ভোগ করেন। প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী গাঙ্গূহতে তাঁর খানকায় হাদীস ও তাসাউফ শিক্ষা দেন। হযরত মাওলানা কাছিম নানুতবীর (র.) ইন্তিকালের পর (১২৯৭ হি:) তিনি দারুল দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন উচুঁ মর্যাদার ফকীহ ও মুজতাহিদ। তাঁর রচিত "ফাতাওয়া রশীদিয়া" একটি উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ। তিনি ৮০ বছর বয়সে ১৯০৮ খৃ: ১২ আগষ্ট গাঙ্গূহতে ইন্তিকাল করেন। (নূর মোহাম্মদ আ'জমী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৯।)

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা সেখানে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন[১]। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনী সর্ব শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের আধুনিক সমরাস্ত্রের সামনে টিকতে পারেনি। ইংরেজরা হিন্দু- মুসলিম সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করে[২]। ১৮৫৭'র সংগ্রামে শাহ'আব্দুল 'আযীযের (র.) দৌহিত্র'আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদীর[৩] অবদান ছিল উল্লেখ যোগ্য । ১৮৫৭'র সশস্ত্র সংগ্রামের পর ১৮৬৩ খৃ: সীমান্তের মুজাহিদ বাহিনীর সাথে ইংরেজ বাহিনীর আরো একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। এভাবে ১৮৫০-১৮৬৩ খৃ: পর্যন্ত 'আলিমগণের নেতৃত্বে ৩৬টি অভিযান পরিচালিত হয়[৪]। কিন্তু দেশী-বিদেশী বিশ্বাস ঘাতকদের মুনাফিকীতে মুক্তি সংগ্রাম ব্যর্থ হলে ইংল্যান্ডের বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট থেকে নিজেদের হাতে নিয়ে দিল্লীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেই সংগ্রামী আলিমগণের উপর ভয়াবহ নির্যাতন শুরু করে। সংগ্রামী 'আলিমগণকে ধরে নির্বিচারে হত্যা, ফাঁসী অথবা আন্দামানে নির্বাসিত করে এবং অবাধে মানুষ হত্যা করে। দিল্লীর শহর, গলি ও রাজপথে লাশের স্তুপ পড়ে যায়। ভারতীয় মুসলমানদের অপমান-অপদস্ত করা, বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতন করা এবং বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করার কোন সুযোগ ইংরেজরা হাতছাড়া করেনি[৫]। সাথে সাথে নানাবিধ আইন, ফরমান ও ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনে। ফার্সীর স্থলে ইংরেজীকে সরকারী ভাষা ঘোষণা করে। মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংসের হীন অপকৌশল হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল

---

১. "নকশ্-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ:৪১-৪৪ ; আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০১।

২. ইনাম -উল- হক, প্রাগুক্ত, পৃ: নয়- দশ।

৩. **মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী ঃ** তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন 'আলিম সমাজের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা ও জ্ঞান সাধনার প্রতীক । তাঁকে প্রাচীন মুসলিম জ্ঞান- বিজ্ঞানের সর্বশেষ প্রবক্তা ও ব্যাখ্যাতা বলে অভিহিত করা হয়। ১৭৯৭ খৃ: তিনি অযোধ্যার অন্তর্গত খায়রাবাদ-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা ফযলে ইমাম ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সাধক এবং দিল্লী সরকারের প্রধান আইন ব্যাখ্যাতা । পিতার যত্নে অতি অল্প বয়সে কুরআন হিফজ করেন। তিনি ন্যায় শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রাচীন পদার্থ বিদ্যার একজন পন্ডিত ছিলেন। হাদীস ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করেন বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ্ 'আব্দুল 'আযীযের (র.) নিকট । ১৮৫৭ এর আযাদী সংগ্রামে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা ওয়াজিব বলে ফাতাওয়া দেন। এ অপরাধের শাস্তি হিসেবে ইংরেজরা তাঁকে নির্বাসন জীবন দিয়ে ১৮৫৯ খৃ: আন্দামানে প্রেরণ করে। তাঁর নির্বাসিত জীবনে কাফনের কাপড়ে লিখা "আস্সাওরাতুল হিন্দিয়া " এবং "কাসিদাতু ফিতনাতিল হিন্দ" আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ । ১৮৬১ খৃ: তিনি আন্দামান দ্বীপে ইন্তিকাল করেন। (মুহিউদ্দীন খান, "আযাদী আন্দোলন- ১৮৫৭", মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ১৩৮৯ ফাল্গুন, পৃ: দুই- পাঁচ।)

৪. মোদ্দাব্বের, মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৯-১২০।

৫. ইদরীস হুশিয়ারপুরী, মুহাম্মদ, "খুতুবাতে মাদানী", যমযম বুক ডিপো, দেওবন্দ, ১৯৯৭, পৃ: ৪২০; হুসাইন আহমদ, মাদানী, "নকশ্-এ হায়াত", ১ম খন্ড, দারুল ইশা'য়াত করাচী, তা: বি, পৃ: ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনের মাধ্যমে 'ইল্‌মে দ্বীন চর্চা ও মুসলিম জ্ঞানসাধনার পথ সংকোচিত করে[১]। ফলে ভারতবর্ষের মাটিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্ঞানসাধনার যে ঐতিহাসিক ধারাটি বিকশিত হয়ে পত্র-পুষ্পে শোভিত হয়েছিল, তা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়[২]। মোট কথা দেশপ্রেমিক 'আলিমগণের উপর অমানুষিক নির্যাতন, আন্দামানে নির্বাসন ও ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলানোর মাধ্যমে তাঁদের আন্দোলনকে স্তব্দ করে দেয়[৩]।

এহেন সংকট পরিস্থিতিতেও 'আলিমগণ দমে যাননি; বরং পুনরায় মুক্তিসংগ্রামের আয়োজন করেন। সুদূর আন্দামানে বসেও ইংরেজ হঠানোর পরিকল্পনা হাতে নেন[৪]। ভারতবর্ষের মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ও তাহযীব- তমদ্দুন বজায় রাখা ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৃটিশ চক্রান্তের হাত থেকে রক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সে উদ্দেশ্যে দেওবন্দের 'আলিমগণ শ্যামলী যুদ্ধের বীর সিপাহসালার হযরত মাওলানা কাসিম নানূতবীর (র.) (১৮৩২-১৮৮০ খৃ:)-এর নেতৃত্বে মুল্লা মাহমূদ[৫] প্রমুখের সহায়তায় বৃটিশের নজর-নিয়ন্ত্রনের বাইরে; বরং সম্পূর্ণ গোপনে সিপাহী বিপ্লবের দশ বছর পর দিল্লী থেকে সত্তর মাইল দূরে সাহারনপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানে ১৮৬৭খৃ: ৩০ মে/১২৮৩হি: ১৫ মহররম প্রতিষ্ঠিত হয় "দারুল 'উলূম দেওবন্দ" মাদ্রাসা[৬]। একজন শিক্ষক মুল্লা মাহমূদ এবং একজন ছাত্র মাহমূদ হাসান[৭]-এর মাধ্যমে ডালিম গাছের নীচে এর শুভ

---

১. আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৩।

২-৩. মুহি উদ্দীন খান, "আযাদী আন্দোলন- ১৮৫৭",মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৩৮৯ ফাল্গুন, ভূমিকা দ্র:।

৪. তাহির, মুহাম্মদ, মাওলানা, "মাল্টার বন্দি", মদনী মিশন, কলিকাতা, ১৯৮৬,পৃ: ৫।

৫. **মুল্লা মাহমূদঃ** মুল্লা মাহমূদ ছিলেন দেওবন্দের অধিবাসী । অত্যন্ত সহজ সরল স্বনামখ্যাত বুযুর্গ। তিনি হাদীস অধ্যয়ন করেছিলেন শাহ্ 'আব্দুল গণী মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.)-এর নিকট। মুল্লা মাহমূদ ছিলেন হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের একজন বিখ্যাত পন্ডিত। প্রথমে তিনি মীরাটের হাশেমী মুদ্রণালয়ে চাকুরি করতেন। বিশ্ব বিখ্যাত দারুল 'উলূম প্রতিষ্ঠিত হলে হযরত মাওলানা কাসিম নানূতবীর(র.) উপদেশক্রমে সেখানে তিনি সর্ব প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁর প্রথম ছাত্র ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান। মুল্লা মাহমূদ ১৮৮৬ খৃ: ইন্তিকাল করেন। দেওবন্দে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। (মুফতী মুহাম্মদ শফী, "মেরে ওয়ালিদ মাজীদ", করাচী, ১৯৭৫, পৃ: ৫১।)

৬. আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬, ১২৪ ; আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৮, ১০৩ ; মুজতবা হুসাইন, এ, এইচ, এম, ডঃ "শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদ হাসান (র.) স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর কূটনৈতিক ভূমিকা", ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৯), পৃ: ৫।

৭. **শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (র.)**ঃ শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান (র.) (১৮৫১ -১৯২০খৃ:) ছিলেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা। একজন পন্ডিত, বাগ্মী, গবেষক, লেখক, কুটনীতিক ও আধাত্মিক

Dhaka University Institutional Repository

সূচনা হয়। পরবর্তীতে এর প্রতিষ্ঠাতাদের ইখলাছের বদৌলতে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সাড়া ভারতে ইহা ব্যাপক গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। ইতিহাসে ইহা "দেওবন্দ আন্দোলন" নামে খ্যাত[১]। অপর দিকে আধুনিক চিন্তাধারার অনুসারী বুদ্ধিজীবীগণ এ মুহূর্তে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামকে বিপজ্জনক মনে করে তা স্থগিত রেখে শিক্ষা শক্তির মাধ্যমে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার কৌশল অবলম্বন করেন। সে উদ্দেশ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খান [২] ১৮৫৭'র বিদ্রোহের সময় অনেক ইংরেজ মহিলাকে আশ্রয় দিয়ে মৃত্যুর হাত

মনীষী। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন ও দার্শনিক শাহ ওয়ালী উল্লাহর (র.) সংস্কার আন্দালনের সফল কর্মী ও যোগ্য উত্তরসূরী । তাঁর কুটনৈতিক তৎপরতা ও সাহসী রাজনৈতিক কর্মসূচী সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজ মসনদের ভিত কাঁপিয়ে তুলেছিল । ১২৬৮ হিঃ / ১৮৫১খৃঃ যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত বেরেলী শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা মাওলানা যুলফিকার আলী ছিলেন বেরেলীর শিক্ষা বিভাগের সরকারী ডেপুটি ইন্সপেক্টর এবং দারুল'উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠাতাদের একজন । শায়খুল হিন্দ শৈশবে মিয়াঁজী মাঙ্গলুবীর নিকট কুরআন মজীদ ও মিয়াঁজী আব্দুল লতীফের নিকট ফার্সীর প্রাথমিক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। মাধ্যমিক পর্যায়ের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন পিতৃব্য মাওলানা মাহতাব আলীর নিকট । তিনি ছিলেন দারুল 'উলূমের প্রথম শিক্ষার্থী। ১২৮৬হিঃ মাওলানা কাসিম নানূতবীর নিকট সিহাহ্ সিত্তাহ অধ্যয়ন করেন। এছাড়া মুল্লা মাহমূদ দেওবন্দী ও মাওলানা ইয়াকুব নানূতবীর নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১২৮৯ হিঃ তিনি দেওবন্দে শিক্ষক হিসেবে পড়াতে আরম্ভ করেন। মাওলানা কাসিম নানূতবীর পর তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দের শায়খুলহাদীস নিযুক্ত হন এবং মৃত্যু অবধি দীর্ঘ চল্লিশ বছর এ পদে বহাল থাকেন । তিনি বৃটিশ শাসন উৎখাতের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে "জমী'অতুল আনসার" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকাশ্যে রাজনীতিতে আর্বিভূত হন । বৃটিশ ভারতে আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮ খৃঃ) সময় হেযায সফর করেন এবং মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে কাবুলে পাঠান। হেযাযে তিনি রেশমী রুমাল আন্দোলনের অপরাধে গ্রেফতার হয়ে তিন বছর সাত মাস মাল্টায় বন্দীজীবন কাটান। ১৯২০ খৃঃ ৮ই জুন তিনি মুক্তি লাভ করে ভারতে ফিরে আসেন এবং ১৯২০খৃঃ ৩০ নভেম্বর ইন্তিকাল করেন । (আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৮-২৩২ ; আসগর হুসাইন, মাওলানা, সায়্যিদ, "হায়াতে শায়খুল হিন্দ", লাহোর, ১৯৭৭, পৃঃ ১৭-২৫, ৩০-৪০, ৮৩-১৮০ ।)

১. অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ আধুনিক যুগ ৩৩০ ।

২. **স্যার সৈয়দ আহমদ খানঃ** স্যার সৈয়দ আহমদ খান ১৮১৭ খৃঃ দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অতঃপর ইংরেজ সরকারের অধীন প্রথমে মুন্সেফ, পরে সাবজজ নিযুক্ত হন। ভারতীয় মুসলমানদের উপর ইংরেজদের অবর্ণনীয় অত্যাচার ও অনাচারে উৎকণ্ঠিত হয়ে মুসলিম সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৫৯ খৃঃ সৈয়দ আহমদ খান " আসবাবে ভাগাওয়াতে হিন্দ" শীর্ষক একটি উর্দূ গ্রন্থে ১৮৫৭'র স্বাধীনতা আন্দোলন ও ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরেন। ১৮৭৩ খৃঃ তিনি উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে এর এক এক কপি বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ করেন। তখন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এ সমূহ অভিযোগ তদন্তের জন্য ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়। স্যার সৈয়দ বৃটিশদের নিকট থেকে সুযোগ সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করেন। ১৮৯৮খৃঃ স্যার সৈয়দ আহমদ খান ইন্তিকাল করেন। (মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬১ ।)

Dhaka University Institutional Repository

থেকে রক্ষা করেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-আন্দোলন স্থগিত রেখে মুসলমানদেরকে ইংরেজদের শিক্ষা ও সভ্যতা- সংস্কৃতি গ্রহণ করে বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য আহবান জানান। সৈয়দ আহমদ সামাজিক উন্নতি, পাশ্চাত্য শিক্ষা,যার প্রতি মুসলমানদের বিদ্বিষ্টভাব রয়েছে; যে কারণে মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা; তা রহিতকরণ, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার আলোকে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রতকরণ, মুসলমানদেরকে ইংরেজী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ সাধন, মুসলিম সমাজ গঠন এবং ইংরেজ সরকারের নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ খৃঃ "আলীগড় স্কুল" এবং ১৮৭৭ খৃঃ "আলীগড় কলেজ" (যা ১৯২০ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়) প্রতিষ্ঠা করেন। যা ইতিহাসে স্যার সৈয়দ আহমদের "আলীগড় আন্দোলন" নামে খ্যাত। স্যার সৈয়দের আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে যথেষ্ট সাহায্য করে[১]।

দারুল'উলূম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র মাহমূদ হাসান শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতা শুরু করেন। সাথে সাথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি চেতনার অগ্নিপুরুষরূপে আর্বিভূত হয়ে "শায়খুল হিন্দ" বা সর্বভারতীয় নেতার আসন গ্রহণ করেন। দারুল উলূম বাহ্যত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও ইহা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই হয়ে ওঠে বিপ্লবের নতুন প্রাণকেন্দ্র। এটা ইংরেজ বিরোধী দুর্গে পরিণত হয়। এখান থেকে ইসলামের সকল শাখায় নেতৃত্ব দেওয়ার মত যোগ্য মনীষী ও কর্মী গড়ে তোলার রাজপথ খুলে যায়। শায়খুল হিন্দের ভাষায়, "এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য হল, "এমন একদল মুজাহিদ তৈরী করা,যাঁদের দ্বারা ১৮৫৭'র ব্যর্থতার প্রতিবিধান করা যায়"[২]। তাই দেওবন্দ থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন নতুন করে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। দারুল উলূমে যাঁরাই শিক্ষাগ্রহণ করতেন তাঁরাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেন। শায়খুল হিন্দ তাঁদেরকে জিহাদের বায়'আত করিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তৎপর করে তুলতেন[৩]। শায়খুল হিন্দ দেওবন্দে অধ্যাপনাকালে একটি বিপ্লবী সংগ্রামী দলও গঠন করেন। যার মাধ্যমে তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতে রোষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। শায়খুল হিন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন ছাত্র-জনতা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সারা ভারতবাসীকে। তবে অতি সংগোপনে। ভেতর-বাইর সংঘাতের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন উদ্দেশ্যে তিনি গুণমুগ্ধ ছাত্র ও ভক্তদের মধ্য থেকে বেঁচে নেন সংগ্রাম পথের সহকর্মী ও

---

১. মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৬১-৫৬৩; অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৫-৩৩০।

২. মাহবূব রিযবী, সায়্যিদ, "তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ", ১ম খন্ড, ইদারা-ই ইহতিমাম দেওবন্দ, ১৯৯৯, পৃ: ৪৪,

৩. মুজতবা হুসাইন, এ, এইচ, এম, ডঃ, "শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমূদ হাসান (র.) স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর কূটনৈতিক ভূমিকা", ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, ৩৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৯), পৃ: ৫।

Dhaka University Institutional Repository

সহযাত্রীদের। মোটকথা শায়খুল হিন্দ বৃটিশ মসনদে কাঁপন ধরিয়ে দেন। তিনি শুধু ভারতবর্ষে নয় বরং গোটা বিশ্বে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ শক্তির পতন ঘটানোর ময়দানে অবতীর্ণ হন[১]।

ভারতবর্ষের মাটিতে যখন এমনি এক সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীও অবস্থা বিরাজ করছিল, তখন পূর্ব পাঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার অর্ন্তগত ছিয়ানওয়ালী গ্রামে একটি বিখ্যাত শিখ পরিবারে ১২ মুহররম ১২৮৯হিঃ / ১০ মার্চ ১৮৭২ খৃঃ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী জন্মগ্রহণ করেন[২] এবং ইসলাম ধর্মের সত্যতায় আকৃষ্ট হয়ে মাত্র ১৫ বছর বয়সে ১৮৮৭ খৃঃ ১৫ আগষ্ট ইসলাম গ্রহণ করেন[৩]। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি দ্বীনি'ইল্‌ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৮৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দারুল'উলূম দেওবন্দ এসে ভর্তি হন[৪]। দারুল'উলূমে ভর্তি হয়ে শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসানের সংস্পর্শ ও ছোঁয়া পেয়ে তিনি জিহাদী মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। শায়খুল হিন্দ নওমুসলিম যুবক উবায়দুল্লাহর মধ্যে প্রতিভা, দৃঢ়তা ও বৈপ্লবিক মনের পরিচয় খুঁজে পান। তাই তাঁর দিকে আলাদা দৃষ্টি রাখেন এবং মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে তিনি একজন বলিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে মনোনীত করেন। মাওলানা সিন্ধীর পক্ষে শায়খুল হিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা মানেই বৃটিশ খেদাও আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা[৫] । তিনি শায়খুল হিন্দের নেতৃত্বে একজন বলিষ্ঠ সহযোগী ও সহকর্মী হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। শায়খুল হিন্দের প্রতিষ্ঠিত "জমী'অতুল আনসার" ও "নাযারাতুল মা'আরিফ"[৬] ইত্যাদি রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্ব দেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন[৭]।

---

১. তাহির, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৬

২. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০৪।

৩. নূর উদ- দীন আহমদ, (অনূ), প্রাগুক্ত, পৃ: ৩।

৪. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০৫।

৫. "নকশ্ – এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ২১২।

৬. শব্দটিকে কেউ কেউ "নিযারাতুল মা'আরিফ" পাঠ করেছেন।

৭. মুজতবা হুসাইন, এ, এইচ, এম, ডঃ, "শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমূদ হাসান (র.) ঃ ইসলামী সাহিত্যে তাঁর অবদান", ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, ৩৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৮), পৃ:৫।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ২

জীবন বৃত্তান্ত

(ক) জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র:) পূর্ব পাঞ্জাবের (পাকিস্তান পাঞ্জাব) শিয়ালকোট জেলার অন্তর্গত ছিয়ানওয়ালী গ্রামে একটি বিখ্যাত শিখ পরিবারে ১২ মুহররম ১২৮৯ হিঃ / ১০ মার্চ ১৮৭২ খৃঃ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের শেষ প্রহরে সুবহ্ সাদিকের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন[১]। তাঁর পিতার নাম রামসিং, দাদার নাম যশপত রায়, প্রপিতামহের নাম গোলাফ রায়। তাঁর জন্মের চার মাস পূর্বেই পিতা রামসিং ইহকাল ত্যাগ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন হিন্দু ধর্মান্তরিত শিখ। জন্মের দু'বছর পর দাদা যশপত রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। দাদার মৃত্যুর পর উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর মাতা তাঁকে নিয়ে পিত্রালয়ে(সিন্ধীর মাতুলালয়) চলে যান । তাঁর মামার বাড়ী ছিল একটি কট্টরপন্থী শিখ পরিবার। সিন্ধীর মাতামহের প্রেরণায় তাঁর পিতা শিখ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন[২]। মাতামহের মৃত্যুর পর সিন্ধী ডেরাগাজী খান জেলার জামপুরে বসবাসকারী মামাদের নিকট চলে যান[৩]।

সিন্ধীর পরিবারের মূল পেশা ছিল স্বর্ণের কারুকার্য বা স্বর্ণাকারী। তবে দীর্ঘকাল থেকে ঐ পরিবারে অনেক লোক সরকারী চাকুরিও করেছেন। আবার কোন কোন সদস্য মহাজনিও করেছেন। সিন্ধীর দাদা যশপত রায় পাঞ্জাবের শিখ শাসনামলে নিজ গ্রামের মসনবদার ছিলেন। তাঁর দু'জন মামা ডেরাগাজী খান জেলার জামপুর এলাকার পাটোয়ারী ছিলেন[৪]।

(খ) শিক্ষা ও ইসলামগ্রহণ

মাওলানা সিন্ধী ১৮৭৮ খৃঃ জামপুর এলাকার উর্দূ মডেল স্কুলে প্রাথমিক লেখা-পড়া আরম্ভ করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ তিনি যখন ঐ মডেল স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে পড়ছিলেন, তখন তিনি দু'বছর শিয়ালকোট জেলায় অবস্থান করেন। এ কারণে তাঁর পড়া-লেখা এক বছর পিছিয়ে যায়। সিন্ধীকে সর্বদা একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে গণ্য করা হত[৫]। মাওলানা সিন্ধী ছাত্র অবস্থাতেই অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। ১৮৮৪ খৃঃ ১২ বছর বয়সে মাওলানা সিন্ধী তাঁরই স্কুলের আর্য সমাজের এক ছাত্রের নিকট থেকে জামপুর জেলার ডেরাগাজী

---

১. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০৪।

২. মাহবূব রিযবী, সায়্যিদ, "তারীখে দারুল'উলূম দেওবন্দ", ২য় খন্ড, ইদারা–ই ইহতিমাম দারুল'উলূম দেওবন্দ, ১৯৯৩, পৃ: ৬৫।

৩-৪.'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০৪।

৫. সারওয়ার, মুহাম্মদ, "খুতুবাত-এ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী", সিন্ধ সাগর একাডেমী, লাহোর,১৯৪৪,পৃ: ৫৮, ১০৪;

Dhaka University Institutional Repository

খান এলাকার একজন নওমুসলিম হিন্দু পন্ডিত যিনি "পন্ডিত মৌলবী"[১] হিসেবে খ্যাত ছিলেন, তাঁর লেখা "তুহফাতুল হিন্দ" নামক একটি গ্রন্থ ধার নিয়ে বারবার অধ্যয়ন করতে থাকেন। এতে ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সুস্পষ্ট ধারণার জন্ম হয়। ঐ সময় মডেল স্কুলের নিকটস্থ কোটলা মোগলান প্রাইমারী স্কুলের কয়েকজন হিন্দু বন্ধুও তাঁর জুটে গিয়েছিল। তারাও "তুহফাতুল হিন্দ"-এর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল[২]। সিন্ধী তাঁর বন্ধুদের মাধ্যমে শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (র.) রচিত "তাকবিয়াতুল ঈমান" গ্রন্থটি পাঠ করার সুযোগ পান। ঐ গ্রন্থটি অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামের তাওহীদ এবং পৌরাণিক শির্ক্ সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। এছাড়া পাঞ্জাবের জনৈক মৌলবী মুহাম্মদ আলী রচিত "আহ্ওয়ালুল আখিরাত" গ্রন্থটিও একজন মৌলবী সাহেবের মাধ্যমে সংগ্রহ করে পাঠ করার সুযোগ লাভ করেন। সিন্ধী "আহ্ওয়ালুল আখিরাত" গ্রন্থটি এবং "তুহফাতুল হিন্দ"-এর যে অধ্যায়ে নওমুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে লিখা হয়েছে, তা বার বার অধ্যয়ন করেন[৩]। এ দুটো গ্রন্থ অধ্যয়নই তাঁকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে[৪]। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, অহিংসা, সৎকর্মে আত্মনিয়োগ ইত্যাদি বিষয় শিখ ধর্মের মূলমন্ত্র। ইসলামের সাথে শিখ ধর্মের এই সাদৃশ্যের ফলে মুসলমান সমাজের সাথে শিখদের ভাব বিনিময় ও মেলামেশার সহজ সুযোগ ছিল। তাই বালক সিন্ধী মুসলমানদরে সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। এতে পরধর্মের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার ভাব ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছিল। তিনি মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্ম-কর্ম খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এসব ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে তাঁর মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেউ তাঁকে ইসলামের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাতে যায়নি। ইসলামের প্রতি প্রবল আকর্ষণেই একদিন তিনি ধর্ম, সমাজ, জাতি, স্বজন, সব বন্ধন ছিন্ন করে চুপ করে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে ১৫ বছর বয়সে ১৫ আগষ্ট ১৮৮৭ খৃ: সিন্ধুর এক মুসলিম ধর্ম সাধকের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কোন প্রকার মোহ, আকর্ষণ, প্রচার, প্রতারণা, ভয়-ভীতি ছাড়াই একান্ত সুস্থ পরিবেশে

---

১. পন্ডিত মৌলবী ঃ "তুহফাতুল হিন্দ" গ্রন্থের রচয়িতা "পন্ডিত মৌলবী" হিসেবে খ্যাত ঐ মনীষী ছিলেন "অনন্ত রাম" নামক একজন আর্য সমাজপন্থী হিন্দু। হিন্দু ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি উক্ত গ্রন্থখানা রচনা করেন। এতে তিনি ইসলামের তাওহীদ ও পুরাণের শির্ক্ সম্পর্কীত ধর্মীয় বিশ্বাসের তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা তুলে ধরেন। অবশেষে তিনি নিজেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তাই মুসলিম সমাজে তিনি পন্ডিত মৌলবী নামে খ্যাতি লাভ করেন। পাঞ্জাবে তাঁর এ ধর্ম সংস্কার আন্দোলন খুবই প্রসার লাভ করেছিল এবং শত শত হিন্দু ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। (মুহাম্মদ মিয়াঁ, সায়্যিদ, "উলামা-এ হক", ১ম খন্ড, দিল্লী, ১৯৪৬, পৃ: ১২৪।)

২. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০৪।

৩-৪. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত,পৃ: ৫৯ ; "নকশ্-এ হায়াত," ২য় খন্ড, পৃ: ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন[১]। ইসলাম গ্রহণের পর তুহফাতুল হিন্দ-এর লেখকের নামানুসারে তাঁর নাম রাখা হয় উবায়দুল্লাহ। সিন্ধী বলেন, "আমি সাধারণত হযরত সালামান ফারসীর অনুসরণ করতে যেয়ে নিজের নাম "উবায়দুল্লাহ ইব্নুল ইসলাম" লিখতাম।" মাওলানা সিন্ধী আরো বলেন, "যদি কেউ এর চেয়ে পরিস্কার ব্যাখ্যাযুক্ত নাম লিখতে বলেন, তাহলে আমি উবায়দুল্লাহ ইব্ন রাম ইব্ন রায় লিখব[২]।" ইসলাম গ্রহণের পর মাওলানা সিন্ধী কোটলা মোগলান স্কুলের বন্ধু 'আব্দুল কাদিরকে সাথে নিয়ে আরবী মাদ্রাসার এক ছাত্রের সাথে মুযাফ্ফরগড় জেলার রহমশাহ্-এ পৌছেন। ১৩০৪ হিঃ ১৩ জিলহজ্ব /সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ খৃঃ তাঁর সুন্নত খাতনা সম্পন্ন হয়। এ ঘটনার কিছু দিন পর সিন্ধীর অভিবাবকগণ তাঁকে পূর্বের ধর্মে ফিরিয়ে নিতে চাইলে, তিনি সিন্ধুতে চলে যান এবং আরবী সর্ফ (শব্দ বিন্যাস)-এর কিতাবসমূহ তিনি ঐ ছাত্রের নিকট পথিমধ্যে অধ্যয়ন করেন[৩]।

সিন্ধুতে উপস্থিত হয়ে তিনি সেখানকার হযরত হাফিজ মুহাম্মদ সিদ্দীক ভরচুন্ডির দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। মূলত ডেরাগাজী খান এলাকার মুসলামানরা সর্বদা পীর-ফকীরের প্রতি অনুরক্ত। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সবাই সূফী সাধকগণের কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিতে আগ্রহান্বিত। সাধারণের উপর সূফী সাধকগণের বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। বালক সিন্ধীর ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম কিছু ঘটেনি। তাই তিনি ইসলাম গ্রহণের পরই আধ্যাত্মিক বায়'আত গ্রহণ করেন[৪]। চার মাস পর্যন্ত মাওলানা সিন্ধী হাফিজ মুহাম্মদ সিদ্দীক ভরচুন্ডির নিকট অবস্থান করেন এবং কাদেরী, রাশেদী তরীকার বায়'আত গ্রহণ করেন। সিন্ধী বলেন, "এর দ্বারা আমার এ লাভ হল যে, ইসলামী জীবন যাপন বিষয়টি আমার এমন স্বভাবে পরিণত হল, যে ভাবে একজন জন্মগত মুসলমানের হয়ে থাকে"[৫]। হাফিজ সিদ্দীক একদিন উপস্থিত ব্যক্তি বর্গের সামনে মাওলানা সিন্ধীর উদ্দেশ্যে বলেন, "উবায়দুল্লাহ আল্লাহর ওয়াস্তে তাঁর পিতা-মাতাকে ত্যাগ করেছে। এখন আমিই তাঁর মা-বাপ"[৬]। এর পর থেকে মাওলানা সিন্ধী তাঁকে ধর্মীয় পিতা বলে মনে করতেন এবং ধর্মীয় পিতার দেশ সিন্ধুকে নিজ ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করেন। তাই তিনি নিজের নামের সাথে সিন্ধী লিখতেন[৭]। সিন্ধুতে মুর্শিদের নিকট চার মাস অবস্থান করার পর সিন্ধী 'ইল্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে সেখান থেকে বিদায় হন। বিদায়কালে মুর্শিদ হাফিজ সিদ্দীক সিন্ধীর জন্য দু'আ করেছিলেন। এ সম্পর্কে মাওলানা সিন্ধী বলেন,"আমার ধারণা যে,আল্লাহ পাক আমার মুর্শিদের ঐ দু'আ কবূল ———

---

১. নূর-উদ্দীন আহমদ, (অনূ), প্রাগুক্ত,পৃঃ ৩।

২. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৪ ; "তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ " ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৫।

৩. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯ ; "নকশ্-এ হায়াত," ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩৮।

৪. নূর-উদ্দীন আহমদ, (অনূ), প্রাগুক্ত, পৃ:১।

৫. "তারীখে দারুল'উলূম দেওবন্দ " ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৫ ; "নকশ্-এ হায়াত," ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩৮।

৬-৭. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৪ - ৪০৫।

Dhaka University Institutional Repository

খান এলাকার একজন নওমুসলিম হিন্দু পন্ডিত যিনি "পন্ডিত মৌলবী "[১] হিসেবে খ্যাত ছিলেন, তাঁর লেখা "তুহফাতুল হিন্দ" নামক একটি গ্রন্থ ধার নিয়ে বারবার অধ্যয়ন করতে থাকেন। এতে ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সুস্পষ্ট ধারণার জন্ম হয়। ঐ সময় মডেল স্কুলের নিকটস্থ কোটলা মোগলান প্রাইমারী স্কুলের কয়েকজন হিন্দু বন্ধুও তাঁর জুটে গিয়েছিল। তারাও "তুহফাতুল হিন্দ"-এর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল[২]। সিন্ধী তাঁর বন্ধুদের মাধ্যমে শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (র.) রচিত "তাকবিয়াতুল ঈমান" গ্রন্থটি পাঠ করার সুযোগ পান। ঐ গ্রন্থটি অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামের তাওহীদ এবং পৌরাণিক শির্ক্ সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। এছাড়া পাঞ্জাবের জনৈক মৌলবী মুহাম্মদ আলী রচিত "আহ্ওয়ালুল আখিরাত" গ্রন্থটিও একজন মৌলবী সাহেবের মাধ্যমে সংগ্রহ করে পাঠ করার সুযোগ লাভ করেন। সিন্ধী "আহ্ওয়ালুল আখিরাত" গ্রন্থটি এবং "তুহফাতুল হিন্দ"-এর যে অধ্যায়ে নওমুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে লিখা হয়েছে, তা বার বার অধ্যয়ন করেন[৩]। এ দু'টো গ্রন্থ অধ্যয়নই তাঁকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে[৪]। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, অহিংসা, সৎকর্মে আত্মনিয়োগ ইত্যাদি বিষয় শিখ ধর্মের মূলমন্ত্র। ইসলামের সাথে শিখ ধর্মের এই সাদৃশ্যের ফলে মুসলমান সমাজের সাথে শিখদের ভাব বিনিময় ও মেলামেশার সহজ সুযোগ ছিল। তাই বালক সিন্ধী মুসলমানদরে সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। এতে পরধর্মের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার ভাব ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছিল। তিনি মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্ম-কর্ম খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এসব ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে তাঁর মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেউ তাঁকে ইসলামের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাতে যায়নি। ইসলামের প্রতি প্রবল আকর্ষণেই একদিন তিনি ধর্ম, সমাজ, জাতি, স্বজন, সব বন্ধন ছিন্ন করে চুপ করে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে ১৫ বছর বয়সে ১৫ আগষ্ট ১৮৮৭ খৃঃ সিন্ধুর এক মুসলিম ধর্ম সাধকের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কোন প্রকার মোহ, আকর্ষণ, প্রচার, প্রতারণা, ভয়-ভীতি ছাড়াই একান্ত সুস্থ পরিবেশে

---

১. পন্ডিত মৌলবী ঃ "তুহফাতুল হিন্দ" গ্রন্থের রচয়িতা "পন্ডিত মৌলবী" হিসেবে খ্যাত ঐ মনীষী ছিলেন "অনন্ত রাম" নামক একজন আর্য সমাজপন্থী হিন্দু। হিন্দু ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি উক্ত গ্রন্থখানা রচনা করেন। এতে তিনি ইসলামের তাওহীদ ও পুরাণের শির্ক্ সম্পর্কীত ধর্মীয় বিশ্বাসের তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা তুলে ধরেন। অবশেষে তিনি নিজেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তাই মুসলিম সমাজে তিনি পন্ডিত মৌলবী নামে খ্যাতি লাভ করেন। পাঞ্জাবে তাঁর এ ধর্ম সংস্কার আন্দোলন খুবই প্রসার লাভ করেছিল এবং শত শত হিন্দু ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। (মুহাম্মদ মিয়াঁ, সায়্যিদ, "উলামা-এ হক", ১ম খন্ড, দিল্লী, ১৯৪৬, পৃঃ ১২৪।)

২. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৪।

৩-৪. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত,পৃঃ ৫৯ ; "নকশ্-এ হায়াত," ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন[১]। ইসলাম গ্রহণের পর তুহফাতুল হিন্দ-এর লেখকের নামানুসারে তাঁর নাম রাখা হয় উবায়দুল্লাহ। সিন্ধী বলেন, "আমি সাধারণত হযরত সালামান ফারসীর অনুসরণ করতে যেয়ে নিজের নাম "উবায়দুল্লাহ ইব্নুল ইসলাম" লিখতাম।" মাওলানা সিন্ধী আরো বলেন, "যদি কেউ এর চেয়ে পরিস্কার ব্যাখ্যাযুক্ত নাম লিখতে বলেন, তাহলে আমি উবায়দুল্লাহ ইব্ন রাম ইব্ন রায় লিখব[২]।" ইসলাম গ্রহণের পর মাওলানা সিন্ধী কোটলা মোগলান স্কুলের বন্ধু 'আব্দুল কাদিরকে সাথে নিয়ে আরবী মাদ্রাসার এক ছাত্রের সাথে মুযাফ্ফরগড় জেলার রহমশাহ্-এ পৌছেন। ১৩০৪ হিঃ ১৩ জিলহজ্ব /সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ খৃঃ তাঁর সুন্নত খাতনা সম্পন্ন হয়। এ ঘটনার কিছু দিন পর সিন্ধীর অভিবাবকগণ তাঁকে পূর্বের ধর্মে ফিরিয়ে নিতে চাইলে, তিনি সিন্ধুতে চলে যান এবং আরবী সর্ফ (শব্দ বিন্যাস)-এর কিতাবসমূহ তিনি ঐ ছাত্রের নিকট পথিমধ্যে অধ্যয়ন করেন[৩]।

সিন্ধুতে উপস্থিত হয়ে তিনি সেখানকার হযরত হাফিজ মুহাম্মদ সিদ্দীক ভরচুন্ডির দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। মূলত ডেরাগাজী খান এলাকার মুসলামানরা সর্বদা পীর-ফকীরের প্রতি অনুরক্ত। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সবাই সূফী সাধকগণের কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিতে আগ্রহান্বিত। সাধারণের উপর সূফী সাধকগণের বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। বালক সিন্ধীর ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম কিছু ঘটেনি। তাই তিনি ইসলাম গ্রহণের পরই আধ্যাত্মিক বায়'আত গ্রহণ করেন[৪]। চার মাস পর্যন্ত মাওলানা সিন্ধী হাফিজ মুহাম্মদ সিদ্দীক ভরচুন্ডির নিকট অবস্থান করেন এবং কাদেরী, রাশেদী তরীকার বায়'আত গ্রহণ করেন। সিন্ধী বলেন, "এর দ্বারা আমার এ লাভ হল যে, ইসলামী জীবন যাপন বিষয়টি আমার এমন স্বভাবে পরিণত হল, যে ভাবে একজন জন্মগত মুসলমানের হয়ে থাকে"[৫]। হাফিজ সিদ্দীক একদিন উপস্থিত ব্যক্তি বর্গের সামনে মাওলানা সিন্ধীর উদ্দেশ্যে বলেন, "উবায়দুল্লাহ আল্লাহর ওয়াস্তে তাঁর পিতা-মাতাকে ত্যাগ করেছে। এখন আমিই তাঁর মা-বাপ"[৬]। এর পর থেকে মাওলানা সিন্ধী তাঁকে ধর্মীয় পিতা বলে মনে করতেন এবং ধর্মীয় পিতার দেশ সিন্ধুকে নিজ ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করেন। তাই তিনি নিজের নামের সাথে সিন্ধী লিখতেন[৭]। সিন্ধুতে মুর্শিদের নিকট চার মাস অবস্থান করার পর সিন্ধী 'ইল্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে সেখান থেকে বিদায় হন। বিদায়কালে মুর্শিদ হাফিজ সিদ্দীক সিন্ধীর জন্য দু'আ করেছিলেন। এ সম্পর্কে মাওলানা সিন্ধী বলেন,"আমার ধারণা যে,আল্লাহ পাক আমার মুর্শিদের ঐ দু'আ কবূল ————

---

১. নূর-উদ্দীন আহমদ, (অনূ), প্রাগুক্ত,পৃঃ ৩।

২. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৪ ; "তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ " ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৫।

৩. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯ ; "নকশ্-এ হায়াত," ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩৮।

৪. নূর-উদ্দীন আহমদ, (অনূ), প্রাগুক্ত, পৃ:১।

৫. "তারীখে দারুল'উলূম দেওবন্দ " ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৫ ; "নকশ্-এ হায়াত," ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩৮।

৬-৭. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৪ - ৪০৫।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। তাই আল্লাহ পাক আমাকে হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন"[১]। ভরচুন্ডি থেকে বিদায় হয়ে সিন্ধী উক্ত তালিবে ইল্‌মের সাথে ভাওয়ালপুর এষ্টেটের একটি গ্রাম্য মসজিদে গিয়ে উঠেন এবং সেখানে প্রাথমিক 'আরবী কিতাবসমূহ পাঠ করেন। অতপর তিনি ভাওয়ালের দীনপুরে পৌঁছেন এবং সেখানে হাফিজ মুহাম্মদ সিদ্দীকের প্রথম খলীফা মাওলানা আবুস্ সিরাজ গোলাম মুহাম্মদ-এর নিকট অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থান করে মৌলবী 'আব্দুর কাদির-এর নিকট 'হিদায়াতুন্ নাহ্‌ব' পর্যন্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা আবুস্ সিরাজ চিঠির মাধ্যমে সিন্ধীর মাকে দীনপুরে ডেকে আনেন। তাঁর মা তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু সিন্ধী তাঁর সিদ্ধান্তে দৃঢ়পদ থাকলেন এবং ক্রমাগত বিচার-বিবেচনার পর ইসলামের যে পথ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে মনের শান্তি-র পথ খুঁজে পেলেন। সুতরাং আর পিছপা হলেন না[২]। সিন্ধী ১৩০৫ হিঃ শাওয়াল /১৮৮৮ খৃঃ জুন-জুলাই মাসে দীনপুর থেকে কোটলা রহমশাহ্-এ চলে যান। সেখানে মৌলবী খোদাবখ্‌শ শাহ্-এর নিকট 'কাফিয়া' কিতাব অধ্যয়ন করেন। এখানে এসে তিনি অপর একজন নতুন ছাত্রের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন মাদ্রাসা সমূহের হাল-হাকীকত সম্পর্কে অবগত হন এবং উচ্চ শিক্ষার আশায় মুযাফ্‌ফরগড় ষ্টেশনে গিয়ে সরারসি 'দারুল 'উলূম দেওবন্দ'- এ উপনীত হন।[৩] ১৩০৬ হিঃ সফর / ১৮৮৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী দারুল 'উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং অনুমান পাঁচ মাসে কুত্‌বী পর্যন্ত মানতিক (যুক্তি বিদ্যা) শাস্ত্রের কিতাবসমূহ বিভিন্ন উস্তাদগণের নিকট পাঠ করেন। "শরহেজামী" গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেন মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ হাসান-এর নিকট। সেখানে তিনি জনৈক বিজ্ঞ উস্তাদের নিকট মুতালা'আ (অধ্যয়ন নীতি) সম্পর্কে জ্ঞান আয়ত্ত করেন এবং কঠোর পরিশ্রম করে ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে অগ্রসর হন[৪]। মানতিক ও হিকমত (দর্শন)-এর কিতাবসমূহ দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য সিন্ধী কয়েক মাসের জন্য কানপুরে মাওলানা আহমদ হাসান-এর মাদ্রাসায় চলে যান। অতঃপর কয়েক মাস রামপুর আলিয়া মাদ্রাসায় অবস্থান করে মৌলবী নাযীর উদ্দীন-এর নিকট অন্যান্য কিতাবসমূহ পাঠ করেন। এ ভাবে নানা স্থানে লেখা-পড়া করার পর ১৩০৭ হিঃ সফর / ১৮৮৯ খৃঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পুনরায় দেওবন্দে ফিরে যান[৫]। দেওবন্দে প্রত্যাবর্তনের পর সিন্ধী মাওলানা হাফিজ আহমদ ও প্রধান শিক্ষক সায়্যিদ আহমদ দেহলবীর নিকট বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করেন। শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান-এর নিকট তিনি জামে' তিরমিযী অধ্যয়ন করেন। শায়খুল হিন্দ তখন দেওবন্দের প্রধান পরিচালক ও উস্তাদ। তিনি নওমুসলিম যুবক উবায়দুল্লাহর

---

১. 'আব্দর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৪-৪০৫।

২-৩. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩৯;'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৫। সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬১।

৪. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৫ ।

৫. "তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ" ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৫ ; সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬১ ।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে প্রতিভা, দৃঢ়তা ও বৈপ্লবিক মনের পরিচয় খুঁজে পান। তাই তাঁর দিকে আলাদা দৃষ্টি রাখেন। সিন্ধী আবূ দাউদ শরীফ মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর নিকট পাঠ করার জন্য গাঙ্গূহ চলে যান। দেওবন্দে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি অনেক শুভ স্বপ্ন দেখেন। মহানবী (সা.)কে স্বপ্নে দেখেন। তাঁর পরীক্ষার খাতাসমূহ দেখে দেওবন্দের শিক্ষকগণ বেশ প্রশংসা করেন[১]।

মাওলানা সিন্ধী হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর নিকট যাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে ওঠেন। তাই চিকিৎসার জন্য দিল্লী গমন করেন এবং হাকীম মাহমূদ খান-এর অধীন চিকিৎসায় দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন। সেখানে তিনি হাদীসের অন্যান্য কিতাবসমূহ মৌলবী 'আব্দুল করীম পাঞ্জাবীর[২] নিকট অধ্যয়ন করেন। দিল্লীতে অবস্থান করার সময় দু'বার তিনি মাওলানা সায়্যিদ নাযীর হুসাইন-এর হাদীসের দরসে শরীক হন এবং সহীহ্ বুখারী ও জামে' তিরমিযীর দু'টি সবক তাঁর নিকট শ্রবণ করেন[৩]। ঐ সময়ের দ্রুত অধ্যয়ন সম্পর্কে সিন্ধী বলেন, "আমার মনে আছে যে, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইব্ন মাজাহ্ প্রতিটি আমি চার দিনে পাঠ করেছি এবং 'সিরাজী' দুই ঘন্টায় সমাপ্ত করেছি"[৪]। দেওবন্দ ও দিল্লীতে শিক্ষা লাভের পর মাওলানা সিন্ধী ২০ জমাদিউস্সানী ১৩০৮ হি: / ১৮৯১ খৃ: ফেব্রুয়ারীতে দিল্লী থেকে সোজা সিন্ধুর শুক্কুর জেলার ভরচুন্ডিতে ফিরে যান। সিন্ধুতে প্রত্যাবর্তনের দশ দিন পুর্বেই তাঁর মুর্শিদ হাফিজ মুহাম্মদ সিদ্দীক ইন্তিকাল করেন। মুর্শিদের বিয়োগ ব্যথা তিনি সহ্য করেন। এরই মধ্যে ১৩০৮ হি: রজব মাসে হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দ থেকে সিন্ধীর জন্য হাদীস শিক্ষা দানের অনুমতি প্রেরণ করেন। এ অনুমতি দানের পর মৌলবী কামাল উদ্দীন তাঁর নিকট বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সুনানে আবূ দাউদ অধ্যয়ন করেন[৫]। ১৩০৯ হি: শাওয়াল / ১৮৯১ খৃ: জুন-জুলাইয়ে মাওলানা সিন্ধী তাঁর মরহূম মুর্শিদের (হাফিজ মুহাম্মদ সিদ্দীক) অপর খলীফা মাওলানা আবুল হাসান তাজ মাহমূদ-এর নিকট শুক্কুর জেলার ইমরোটে চলে যান। মাওলানা আবুল হাসান তাজ মাহমূদ তাঁর মুর্শিদের আদেশ-নির্দেশ নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন এবং মাওলানা সিন্ধীর সাথে পিতৃসুলভ আচরণ করতেন। মাওলানা তাজ মাহমূদ শুক্কুর ইসলামিয়া স্কুলের শিক্ষক মৌলবী মুহাম্মদ আযীম খান ইউসুফ জাই-এর কন্যার সাথে মাওলানা সিন্ধীর বিয়ে দেন। তিনি সিন্ধীর মাকে সেখানে ডেকে পাঠান[৬]। সিন্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন, "এরপর

---

১. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৫।

২. মৌলবী 'আব্দুল করীম পাঞ্জাবী ছিলেন মাওলানা কাসিম নানূতবী ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর নির্ভর যোগ্য শাগরিদ। ('আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৫।)

৩. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৩ ; আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৫।

৪. "তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ", ২য় খন্ড, পৃ: ৬৫; 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৫।

৫. "তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ", ২য় খন্ড, পৃ: ৬৫; 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৫।

৬. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে আমার মা আমার তরীকার উপরই ছিলেন"[১]। সিন্ধী ইমরোটে অবস্থানকালে অধ্যয়নের জন্য একটি বিশাল লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। ১৩১৫ হিঃ পর্যন্ত মাওলানা সিন্ধী মাওলানা আবুল হাসান তাজ মাহমূদের স্নেহ - ছায়ায় থেকে জ্ঞানার্জন ও গবেষণায় লিপ্ত থাকেন। ইমরোটে থাকাকালে তিনি হায়দারাবাদ জেলার গোঠপীরঝান্ডা এলাকার রাশেদী তরীকার পীর রশীদ উদ্দীন-এর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনী ইল্‌মের বিশাল লাইব্রেরীতে যেয়েও লেখাপড়া করতেন এবং কিতাব ধার নিতেন। মাওলানা সিন্ধী বলেন, "আমার অধ্যয়ন ও জ্ঞান সাধনার বিষয়ে ঐ কুতুব খানা বিরাট ভূমিকা রেখেছে" [২]। এ সময় মাওলানা সিন্ধী কাদেরিয়া তরীকা এবং নকশে বন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরীকার আধ্যাত্মিক সাধনার নিয়ম-পদ্ধতি হাফিজ মুহাম্মদ সিদ্দীক-এর প্রধান খলীফা মাওলানা আবুস্ সিরাজ দীনপুরীর নিকট থেকে আয়ত্ত করেন। সে জন্য তিনি দীনপুরেও যাতায়াত করতেন। মাওলানা সিন্ধী বলেন, "আমার দুনিয়ার কোন প্রয়োজন ইমরোটে পূরণ করা সম্ভব না হলে তা দীনপুর থেকে অর্জন করে নিতাম। এ ভাবে আমাকে ইহকাল ও পরকালের কোন প্রয়োজনেই মুর্শিদের বাইরে যেতে হয়নি"[৩]।

১৩১৫ হিঃ / ১৮৯৭ খৃঃ মাওলানা সিন্ধী পুনরায় দেওবন্দে গমন করেন। সাথে এত দিনকার অধ্যয়ন ও গবেষণার ফল স্বরূপ দু'টি পুস্তিকা লিখে নিয়ে যান। এর একটি ছিল হাদীস বিষয়ে এবং অপরটি হানাফী ফিক্‌হ বিষয়ে। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে তিনি কোন কোন মাস'আলায় জমহুর আহলে 'ইল্‌মের খেলাফ মুহাক্কিকগণের রায়কে প্রাধান্য দেন। শায়খুল হিন্দ পুস্তিকা দু'টোকেই পছন্দ করেন[৪]। মাওলানা সিন্ধী এবার দেওবন্দে এসে দশ বারটি হাদীসের কিতাব মুখস্ত শুনিয়ে পুনরায় শায়খুল হিন্দের পক্ষথেকে হাদীস শিক্ষাদানের অনুমতি লাভ করেন। জিহাদ সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলার আলোচনা এবং সিন্ধী একটি মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তুলবেন বলে মনে মনে যে পরিকল্পনা করেছিলেন, সে সম্পর্কে শায়খুল হিন্দের সাথে কথা বলেন। শায়খুল হিন্দ তাঁর এ বিষয়টি খুব পছন্দ করেন এবং তাতে কিছু সংশোধনের পরামর্শ দিয়ে এটাকে ইসলামী সংহতির একটি বিশেষ অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন। এ কাজ অব্যাহত রাখার জন্যও সিন্ধীকে পরামর্শ দেন। এর পর থেকে মাওলানা সিন্ধীর শিক্ষা ও রাজনৈতিক যাবতীয় বিষয়ের সম্পর্ক শায়খুল হিন্দের সাথে স্থাপিত হয়[৫]। সিন্ধী বলেন, "আল্লাহর অসংখ্য রহমতের মধ্যে একটি বিরাট নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব হবে না, সেটি হলঃ ফিক্‌হ ও হাদীসের গভীর জ্ঞান অনুসন্ধান ও পবিত্র কুরআনের তাফসীর বিষয়ে হযরত মাওলানা কাসিম

১-২. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৫-৪০৬।

৩-৪. ঐ, পৃঃ ৪০৬; সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৫-৬৬।

৫. "তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ", ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৫; 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৬-৪০৭; সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৬-৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

দেওবন্দী থেকে আরম্ভ করে দিল্লীর ইমাম পর্যন্ত আলিমগণ আমার রাহ্‌বর হয়ে গেলেন। তাঁদেরকে আমি আমার ইমাম নির্বাচন করেছি। আমাকে ইল্‌মী ও সিয়াসী উন্নতির জন্য এই সিলসিলার বাইরে যেতে হয়নি। এর দ্বারা আমার প্রচেষ্টাসমূহ একটি নীতির মধ্যে শৃঙ্খলিত হয়। আমি ইসলামী দর্শনের যোগ্যতা অর্জন করি। আমি দিল্লীতে থাকাকালে "কিবলানামা" অধ্যয়ন করি। গ্রন্থটির পরিচিতি আমার আত্মার সাথে বিজড়িত হয়। হাদীসের ব্যাখ্যা ও অনুসন্ধানে "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" গ্রন্থের পরিচয় শায়খুল হিন্দ করিয়ে দিয়েছিলেন। শেষমেষ এ ভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে আমার ভেতর স্থিতিশীলতা এসেছে। আমি 'আলিমদেরকে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ পড়িয়েছি"[১]।

---

১. "তারীখে দারুল'উলূম দেওবন্দ", ২য় খন্ড, পৃ: ৬৫; 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৬-৪০৭;

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৩
কর্মজীবন

(ক) গোঠপীরঝান্ডায় 'দারুল ইরশাদ' প্রতিষ্ঠা

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে মাওলানা সিন্ধী প্রথমে শুক্কুর জেলার ইমরোটে ফিরে এসে মাওলানা তাজ মাহমূদের নিকট অবস্থান করেন। সেখানে "দারুল ইশা'আত" নামক একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং দু'বছর পর্যন্ত তা চালু রাখেন। কয়েকটি আরবী ও সিন্ধী ভাষার দুষ্প্রাপ্য কিতাব প্রকাশ করেন। একটি মাসিক পত্রিকা "আল-ইখওয়ান" প্রকাশ করতে থাকেন। এ সময় তিনি সেখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি। যেহেতু ধর্মীয় বিষয়ের কাজসমূহ মাদ্রাসা ব্যতীত সম্পাদন করা সম্ভব হয়না, তাই মাদ্রাসা স্থাপনের চেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে সফল হন। তাঁর মুর্শিদের চতুর্থ খলীফা মাওলানা রশীদুল্লাহর সহযোগিতায় ১৩১৯ হিঃ / ১৯০১ খৃঃ হায়দারাবাদ জেলার গোঠপীরঝান্ডায় এসে তাঁর পরিকল্পনা মতে একটি মাদ্রাসা "দারুল ইরশাদ" প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসার নামটিও তিনি নির্বাচন করেন। দীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত সে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। একবার ঐ মাদ্রাসায় পরীক্ষা নেয়ার জন্য শীর্ষ স্থানীয় আলিমগণের মধ্যে শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান ও শায়খ হুসাইন বিন মুহসিন ইয়ামানী গিয়েছিলেন। মাওলানা সিন্ধী ঐ মাদ্রাসায় থাকাকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও ইমাম মালিক (র.) কে স্বপ্নে দেখেছিলেন বলে তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন[১]।

(খ) প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম

১৩২৭ হিঃ রমাযান / ১৯০৯ খৃঃ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান (র.) মাওলানা সিন্ধীকে দেওবন্দে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে দেওবন্দে অবস্থান করে "জমী'অতুল আনসার"–এর কাজ করে যাওয়ার জন্য হুকুম দেন। এতে তাঁর "দারুল ইরশাদ" প্রতিষ্ঠানের সাথেও সম্পর্ক বজায় থাকবে বলে জানিয়ে দেন। অধ্যাপক এস.এম ইকরাম বলেন, "শায়খুল হিন্দ ১৯০৬ খৃঃ "জমী'অতুল আনসার" প্রতিষ্ঠা করে এর কাজকর্ম আরম্ভ করেন। তিনি মাওলানা সিন্ধীকে দেওবন্দে অবস্থান করে জমী'অতুল আনসারের সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন"[২]। সিন্ধী চার বছরকাল দেওবন্দে অবস্থান করে জমী'অতুল আনসারের কাজকর্ম পরিচালনা করেন এবং একে মজবূত সাংগঠনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এমনকি তিনি এর সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। জমী'অতকে সংগঠিত করতে মাওলানা সিন্ধীকে

---

১. আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৬-৪০৭ ; সারওয়ার মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬-৬৭।

২. ইকরাম, এস, এম, "মওজে কাওসার", তাজ কোম্পানী, দিল্লী, ১৯৯১, পৃঃ ২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক[১], মাওলানা আবূ মুহাম্মদ আহমদ লাহোরী সাহায্য করেন[২]। এই জমী'অতের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, দেশকে বৃটিশ দখলমুক্ত করতে দেওবন্দ মাদ্রাসা ও আলীগড় কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করা এবং বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলা। উল্লেখ্য, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসিম নানূতবী (র.) এবং আলীগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান উভয়ে দিল্লীর একই মাদ্রাসার ছাত্র এবং একই শিক্ষক মাওলানা মামলূক আলী[৩]-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন[৪]। কিন্তু আযাদী সংগ্রাম ও বৃটিশ বিতাড়ণ বিষয়ে দু'জনের চিন্তাধারা ও কর্মে ব্যাপক ব্যবধান ছিল। হযরত নানূতবী বেছে নেন বিপ্লবের পথ, আর স্যার সৈয়দ বেছে নেন আপোষকামীতার পথ। হযরত নানূতবী (র.) ১৮৫৭ 'র মহাবিদ্রোহের সময় শ্যামলীতে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী শিক্ষা ও দর্শন প্রচারের ব্যবস্থা করেন[৫]। অন্য দিকে স্যার সৈয়দ

---

১. **মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক** ঃ মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক ছিলেন করাচীর অধিবাসী। তিনি উপরের ক্লাসের কিতাবসহ হাদীসের কিতাবসমূহ শায়খুল হিন্দের নিকট অধ্যয়ন করেন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর সাথে ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী যখন ইরাকের উপর হামলা চালিয়েছিল, তখন তিনি বিসবিলা, বেলুচিস্তান ইত্যাদি এলাকায় বিদ্রোহ করেন। কারণে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে সিন্ধু এলাকায় থামিয়ে দিতে বাধ্য হয় । তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অপরাধে গ্রেফতার হয়ে নজরবন্দি হন। বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হলে পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। মাওলানা সাদিক ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শূরার সদস্য এবং "জমী'অতে উলামায়ে হিন্দ"-এর মজলিসে আমেলার রুকন। ১৮ জুন ১৯৫৩ খৃ: তিনি ইন্তিকাল করেন। (আব্দুর রশীদ আরশাদ , প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৭।)

২. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৭।

৩. **মাওলানা মামলূক আলী** (র.)ঃ মাওলানা মামলূক আলী ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত সাহ্রনপুর জেলার নানূতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাহ্ আব্দুল আযীয (র.) (১৭৪৬-১৮২৪খৃঃ) এবং মাওলানা রশীদ উদ্দীন খান (মৃ ১৮৩৩ খৃঃ)-এর নিকট ইসলামিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয় অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী সরকারী কলেজের আরবী বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ কলেজে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। আরবী ও ফিক্হ বিষয়ে তিনি সমকালীন আলিমগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সকল বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। সে যুগে ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য পন্ডিতগণ ছিলেন তাঁর ছাত্র। ১৮৫১ খৃ: তিনি জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর (র.) পারিবারিক গোরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে। (মুজতবা হোসাইন, এ, এইচ, এম, "উপমহাদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও আল্লামা নানূতবী", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, পৃ: ২৮৯।)

৪. আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, ডঃ, "স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা", ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ: ১১৭।

৫. নূর- উদ্দীন আহমদ (অনূ), প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৩-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ খান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীন চাকুরী গ্রহণ করেন। মহাবিদ্রোহে ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি ইংরেজদের শিক্ষা, সভ্যতা- সংস্কৃতি গ্রহণ করে বৈষয়িক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ খৃঃ "আলীগড় স্কুল" এবং ১৮৭৭ খৃঃ 'আলীগড় কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। একই প্রতিষ্ঠান ও একই শিক্ষকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে দু'জন দু'দিকে বিভক্ত হয়ে যাওয়া ছিল, মূলত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তাধারার অনুসারীদের দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া। তবে দেওবন্দ ও আলীগড়ের শিক্ষা-দর্শনে বিস্তর পার্থক্য থাকলেও হযরত নানূতবী ও স্যার সৈয়দ আহমদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি হয়নি। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা কিংবা জাগতিক শিক্ষা অর্জন করাকে দেওবন্দের আলিমগণ কখনো হারাম বলেননি; বরং ইসলামী আকীদা ও চিন্তাধারা অক্ষুন্ন রেখে যে কোন বৈষয়িক শিক্ষা গ্রহণ করা জায়িয [১]। তবে স্যার, সৈয়দ আহমদ আলীগড় আন্দোলন শুরু করার পর নানাভাবে বিতর্কিত এবং কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হন। স্যার সৈয়দের জীবনীকার মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী লিখেন, "মাদ্রাসাতুল উলূম (আলীগড় কলেজ)- এর সবচেয়ে কঠোর সমালোচক ছিলেন কানপুর জেলার ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী ইমদাদ আলী এবং অপরজন গোরাখপুর জেলার সাবজজ মৌলবী আলী বক্শ্। এমনকি আলীগড় কলেজকে নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিতর্কের ঝড় বয়েছিল উপরোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের সমালোচনার সূত্র ধরে" [২]। স্যার সৈয়দ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে সীমিত না রেখে, পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সভ্যতা- সংস্কৃতি ও তাদের বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা-ধারাকে প্রাণ খুলে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। তাছাড়া তাঁর সম্পাদিত "তাহযীবুল আখলাক" পত্রিকায় বিভিন্ন সময় ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর কঠোর ভাষায় কটাক্ষ করেছিলেন[৩]। এসব কারণে তিনি দারুণ সমালোচিত হন[৪] । ডেপুটি ইমদাদ আলী ও আলী বক্শ হেযায থেকে স্যার সৈয়দ আহমদের উপর কুফুরীর ফাতাওয়া সংগ্রহ করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিলি করলে তিনি মানসিকভাবে ভীষণ বিব্রত হন। দেওবন্দের 'আলিমগণ স্যার সৈয়দের চিন্তা ও দর্শন সমর্থন না করলেও উক্ত ফাতাওয়ায় শরীক হওয়াকে পছন্দ করেননি;বরং স্যার সৈয়দকে আন্ত–রিকতার সাথে পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করেন[৫]। পরবর্তীকালে শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান উভয় প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তিনি আলীগড়ের একাডেমিক সম্পর্ককে দেওবন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ করতে উদ্দোগী হন। আর সে উদ্দোগের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ১৯০৬ খৃঃ জমী'অতুল আনসার প্রতিষ্ঠা করা। জমী'অতুল আনসার প্রতিষ্ঠার পেছনে শায়খুল হিন্দের অপর একটি সুদূর প্রসারী গোপন কর্মসূচী এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল। তাহলঃ দেওবন্দ

---

১. "নকশ্-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ২৫৭।

২. আলতাফ হুসাইন হালী, "হায়াতে জাদীদ", নয়াদিল্লী, ১৯৭৯, পৃঃ ৫৪১-৫৪২।

৩–৪. "স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা", পৃঃ ৯৮-৯৯।

৫. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, মাওলানা,"শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মদনী (র.)ঃ জীবন ও সংগ্রাম", জামান প্রিন্টার্স, ঢাকা,১৯৯১,পৃঃ ৩৭০।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্রদের নিয়ে একটি মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলা এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাঁদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দেয়া[১]। মাওলানা সিন্ধী সেই কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে চার বছর (১৯০৯-১৯১৩খৃঃ) জমী'অতুল আনসার পরিচালনা করেন।

জমী'অতুল আনসার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে ১৩২৮ হিঃ /১৯১০খৃঃ দেওবন্দ মাদ্রাসার দস্তারবন্দী (পাগড়ী পরিধান) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে প্রধান কার্যনির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা নিয়ন্ত্রনে ছিলেন শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী[২] (র.) ও মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী প্রমুখ। সেটি ছিল দারুল 'উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার ৪৫ বছর পর পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠান[৩]। উক্ত অনুষ্ঠানে দারুল 'উলূম দেওবন্দ থেকে ফারিগ (শিক্ষা প্রাপ্ত) দু'শ জন 'আলিমকে মর্যাদা ও স্বীকৃতির পাগড়ী পরানো হয়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিলেন, হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী[৪], মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ও মুফতী

---

১. মুহাম্মদ মিয়াঁ, সায়্যিদ, "উলামায়ে হক", ১ম খন্ড, দিল্লী, ১৯৪৬, পৃ: ১২২-১২৩।

২. **শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী** (র.)ঃ শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী ১২৯৬ হিঃ / ১৮৭৮ খৃঃ যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত উনাও জেলার এক সম্ভ্রান্ত সায়্যিদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৩০৯ হিজরীতে দেওবন্দে প্রবেশ করেন। সেখানে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর নিকট বুখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ ও মুয়াত্তা ঈমাম মালিক অধ্যয়ন করেন। মাওলানা 'আব্দুল আলীর নিকট মুসলিম শরীফ, নাসায়ী শরীফ ও ইব্ন মাজাহ শরীফ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর নিকট বায়'আত হয়ে খিলাফত লাভ করেন। ১৩১৬ হিজরীতে তাঁর পিতা মাষ্টার সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ সপরিবারে মদীনায় হিজরত করলে তিনি তাঁদের সংগী হন। শায়খুল ইসলাম মাদানী ১৩ বছর মদীনার মসজিদে নববীতে, ২ বছর কলিকাতার কওমী মাদ্রাসায়, ৫ বছর সিলেটের কওমী মাদ্রাসায় এবং ৩১ বছর দারুল উলূম দেওবন্দে হাদীস শিক্ষাদান করেন। তিনি দারুল উলূমের প্রধান অধ্যাপক এবং শায়খুল হাদীসও ছিলেন। দীর্ঘ ৫০ বছরব্যাপী হাদীস শিক্ষাদান করে ১৩৭৭ হিঃ/ ১৯৫৭ খৃঃ ৮২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। শায়খুল ইসলাম যেমনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও সূফী, তেমনি ছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে একজন সংগ্রামী পুরুষ ও প্রখ্যাত রাজনীতিক। তাঁর মত চেতনাধারী রাজনীতিক সে যুগে ভারতে খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর। বৃটিশের হাতে তিনি বহু নির্যাতন ভোগ করেছেন। জীবনের এক বিরাট অংশ জেলখানায় কাটিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানীর কুরবানীর কথা জাতি কখনো ভুলতে পারবে না। (নূর মোহাম্মদ আ'জমী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ- ১৭৯।)

৩. "দৈনিক জমী'অত" দিল্লী, ২৬ মার্চ ১৯৮০ খৃঃ, দারুল উলূম দেওবন্দ এর সদসালাহ (শত বর্ষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান) উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা, পৃ: ২২৬।

৪. **হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী** (র.)ঃ হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী ১২৯২হিঃ শাওয়াল/১৮৭৫ খৃঃ ২৭ অক্টোবর কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা মাওলানা সায়্যিদ মুয়াজ্জম শাহ্ (র.) একজন দক্ষ আলিম ছিলেন। অল্প বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ করে প্রাথমিক শিক্ষা নিজ

Dhaka University Institutional Repository

কিফায়াত উল্লাহ[১] প্রমুখ। যদিও তাঁরা অনেক আগেই ফারিগ হয়েছিলেন[২]। ছয়শ' জন 'আলিম পাগড়ী গ্রহণ করার কথা ছিল, কিন্তু চারশ' জনই অনুপস্থিত ছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ত্রিশ হাজার 'আলিম, সাধারণ শিক্ষিত ও সুধীজনের সমাবেশ হয়েছিল। আলীগড় নেতা সাহেবজাদা আফতাব আহমদ খানের নেতৃত্বে ইসলামী ইউনিভার্সিটি সমূহের শিক্ষক ছাত্রের এক বিরাট সংখ্যক কাফেলা তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাওলানা সিদ্ধীর উদ্দেশ্য ছিল, দেওবন্দে পড়ুয়া ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষিতদেরকে পরস্পর কাছে নিয়ে আসা[৩]। উক্ত সভায় মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহী সভাপতির ভাষণে বলেন, "কোন কোন প্রগতিবাদী বলে থাকেন যে, জমী'অতুল আনসার হল আলীগড় "ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশন"-এর একটি অনুকরণ মাত্র। কিন্তু এ ধারনা ঠিক নয়। জমী'অতুল আনসারের আন্দোলন ত্রিশ বছর আগে শুরু হয়েছে। এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন এই দেওবন্দেরই কৃতিত্বের অধিকারী ছাত্র, যিনি আজ জ্ঞানের উৎস (মাহমূদ হাসান) বলে পরিচিত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর সেই আন্দোলনকে পুনুরুজ্জীবিত করে এর নাম রাখা হয়েছে "জমী'অতুল আনসার"। এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এখন অতীব জরুরী হয়ে গেছে"[৪]। উক্ত অনুষ্ঠানে আলীগড় নেতা সাহেবজাদা আফতাব আহমদ খান প্রস্তাব করেছিলেন, দারুল 'উলূমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা আলীগড় কলেজে ইংরেজী পড়তে পারবে। তাদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে এবং আলীগড় কলেজের গ্র্যাজুয়েটরা দ্বীন প্রচার ও আরবী শিক্ষার আগ্রহ পোষণ করলে দারুল 'উলূম দেওবন্দে ধর্মীয় শিক্ষা নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে[৫]। এ

গ্রামেই অর্জন করেন। ১৩১০ হি: দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে ১৩১৪ হি: শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর খেদমতে অবস্থান করে হাদীসের সনদ লাভ করেন। অতঃপর বিজনূর চলে যেয়ে সেখানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর কাশ্মীরে চলে যেয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৩২৫ হি: হজ্জ আদায় শেষে দেওবন্দে এসে অধ্যাপনা করেন। ১৩৪৬ হি: তিনি ডাভেলে চলে যেয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত 'ইল্‌মে দ্বীনের চর্চায় নিয়োজিত থাকেন । ১৩৫২ হি: তিনি দেওবন্দে মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।(হাবীবুর রহমান, মুহাম্মদ, মাওলানা, " আমরা যাদের উত্তরসূরী" আলকাউসার প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ: ৭৭-৮০।)

১. **মুফতী কিফায়াত উল্লাহ** ঃ মুফতী কিফায়াত উল্লাহ ১২৯২ হি: শাহজাহানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর শাহজাহানপুর মাদ্রাসায় লেখা পড়া করেন । ১৩১৩ হি: দারুল উলূম থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর শাহজাহানপুরে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ১৩২১ হি: তিনি একটি মাসিক পত্রিকা "আল-বুরহান" প্রকাশ করেন। তবে তিনি একজন উল্লেখযোগ্য মুফতী হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিশে সূরার সদস্য ছিলেন । ১৩৭২ হি: ১৩ রবিউস্‌সানীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। (তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ, ২য় খন্ড, পৃ: ৭৯-৮১।

২. "দৈনিক জমী'অত, দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ -২৫২।

৩. ঐ, পৃ- ২২৬।

৪-৫ . "উলামা–এ হক", ১ম খন্ড, পৃ:১২২-১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দোগের ফলে উভয় প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। ১৯১১ খৃ: ১৫-১৭ এপ্রিলে মুরাদাবাদ শহরে জমী'অতুল আনসারের সর্বপ্রথম সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে দস্তারবন্দী অনুষ্ঠানের ন্যায় শায়খুল হিন্দের প্রোগ্রামকে সামনে এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয় এবং কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ঐ সভা বেশ সাফল্য অর্জন করেছিল[১]।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা সিন্ধীর নিকট দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার অর্ন্তনিহিত বৈপ্লবিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য খুলে বলেছিলেন । সিন্ধী শায়খুল হিন্দের নিকট দীক্ষা নিলেন, জিহাদের মাধ্যমে জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। দুনিয়ার মসনদ, মসনব, মর্যাদা ও রাজত্ব জিহাদের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। যে জাতির মধ্যে জিহাদের স্পিরিট নির্বাপিত হয়েছে, তারাই অপমান-অপদস্ত হয়েছে। দুনিয়ার অন্যান্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তারা পতিত জাতি হিসেবে পরিণত হয়েছে। সুতরাং মাওলানা সিন্ধী ইসলামকে যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, দেওবন্দের 'আলিমগণের একাংশের তা মনঃপূত ছিলনা। ফলে জিহাদ ইত্যাদির ন্যায় ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁর মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। বিষয়টিকে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসা ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করেন । তাই মাওলানা সিন্ধী তাদের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন । এ পরিস্থিতিতে তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং শায়খুল হিন্দের নিদের্শে দিল্লী চলে যান[২]। কিন্তু এতে দেওবন্দের ছাত্র-শিক্ষকগণের সাথে সিন্ধীর সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি হলেও শায়খুল হিন্দের সাথে তাঁর সর্ম্পকের সামান্য অবনতি হয়নি। তিনি গোপনে শায়খুল হিন্দের সাথে যোগাযোগ করতেন এবং তার নিকট যাতায়াত করতেন । রাতের অন্ধকারে দেওবন্দের বাইরে শায়খুল হিন্দের সাথে সাক্ষাৎ করতেন ও প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতেন[৩]। দিল্লীতে যেয়ে সিন্ধী কুরআনের শিক্ষা ও মূল্যবোধের আদর্শে মুসলমান সমাজকে গড়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৩৩১ হি:/১৯১৩ খৃ: নভেম্বর মাসে তিনি দিল্লীর ফতেহপুরী মসজিদে "মাদ্রাসাতুল নাযারাতুল মা'আরিফিল কুরআনিয়া" সংক্ষেপে "নাযারাতুল মা'আরিফ" প্রতিষ্ঠা করেন[৭]। উক্ত প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান, হাকিম আজমল খান দেহলবী ও নওয়াব ওয়াকারুল মুল্ক[৪] প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। শায়খুল হিন্দ

১. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৬।

২-৩. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৪৪-১৪৫।

৪. **নওয়াব ওয়াকারুল মুলক্:** নওয়াব ওয়াকারুল মুলক্ ছিলেন একজন সমাজ সেবক এবং মুসলিম লীগের প্রথম সম্পাদক। উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদ জেলার এক গ্রামে ১৮৪১ খৃ: তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মুশতাক হুসাইন। ১৮৬১ খৃ: মুরাদাবাদে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কাজ করতে যেয়ে স্যার সৈয়দ আহমদের সংস্পর্শে আসেন এবং আলীগড়ে তাঁর অধীনে কেরানীর চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে তিনি সাবজজ মৌলবী সমিউল্লাহ খানের অধীনেও কাজ করেন । ১৮৭৫ খৃ: তিনি মুহসিন-উল-মুলকের সাথে হায়দারাবাদ গমন করেন এবং ১৮৯২ খৃ: পর্যন্ত সেখানে বিভিন্ন উচ্চপদে সমাসীন হন। হায়দারাবাদ থেকে অবসর গ্রহণের পর আমরোহায় অবসর জীবন যাবন করেন। ১৯০১ খৃ: অক্টোবরে লক্ষ্মৌতে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে মুসলমানদের দাবী উত্থাপন করেন। ১৯০৭খৃ: আলীগড় কলেজ কমিটির সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ১৯১৭খৃ: ২৭জানুয়ারী ৭৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁকে আমরোহায় সমাহিত করা হয়েছে। (ইনাম-উল-হক , প্রাগুক্ত, পৃ: ৯২-৯৮।)

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সিন্ধীকে নাযারাতুল মা'আরিফে শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে যাবার হুকুম দেন। ঐ প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল, পাশ্চাত্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমান যুবকদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়া এবং ইংরেজী শিক্ষার ফলে ইসলাম সর্ম্পকে তাদের মধ্যে যেসব ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়, তা দূর করা। সাথে সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান এবং ভারতীয় সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, তা ভেংগে দেয়া এবং তাদের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটানো [১]। প্রতিষ্ঠানটি নতুন ও পুরনো সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষিতদেরকে পরস্পর কাছে টেনে আনতে বেশ ভূমিকা পালন করেছিল বটে। পাঞ্জাবের ইংরেজী কলেজের মুসলমান ছাত্ররা যে দেশ ত্যাগের আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন, তা ছিল ঐ চেষ্টারই ফলাফল। মাওলানা সিন্ধীই সে আন্দোলনকে চাঙ্গা করেছিলেন[২]। শায়খুল হিন্দ মাওলানা সিন্ধীকে দেওবন্দে রেখে যেমন তাঁর দলের লোকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি দিল্লীর নেতৃবৃন্দের সাথেও সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি একবার দিল্লী গমন করেন এবং ডাঃ মুখতার আহমদ আনসারী'র[৩] (১৮৮৮০-১৯৩৬খৃ:) সাথে সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দেন। এর পর ডাঃ আনসারী মাওলানা আবুল কালাম আযাদ[৪] (১৮৮৮-১৯৯৮ খৃ:) ও মাওলানা মুহাম্মদ

১-২. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৬।

৩. **ডাক্তার মুক্তার আহমদ আনসারীঃ** ডাক্তার মুক্তার আহমদ আনসারী উত্তর প্রদেশের গাজীপুর জেলার ইউসুফপুর গ্রামে ১৮৮০ খৃ: জন্মগ্রহণ করেন। বেনারসে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ইলাহাবাদ কলেজ থেকে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর হায়দারাবাদের নিযাম কলেজ থেকে বি, এ পাশ করার পর লন্ডন মেডিকেল কলেজ থেকে এম, বি, বি এস কোর্স সমাপ্ত করেন। ১৯১১ খৃ: তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯২২ খৃ: তিনি মেডিকেল মিশন নিয়ে তুর্কী গমন করেন । ১৯২৩ খৃ: "স্বরাজ পার্টি" এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্টির মধ্যে সমঝোতায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৭ খৃ: মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৫ খৃ: কংগ্রেসের "গোল্ডেন জুবিলী " উদ্বোধন করেন। এই স্বনামধন্য মনীষী ১৯৩৬ খৃ: রামপুর থেকে দিল্লী আসার পথে ট্রেনে আকস্মিক ইন্তিকাল করেন। (ইনতিযামুল্লাহ, মুফতী "মাশাহীরে জঙ্গে আযাদী", মুহাম্মদ সাঈদ এন্ড সন্স, করাচী, ১৩৭৬ হি:, পৃ: ২৮৯-২৯০; নকশ্-এ হায়াত, ২য় খন্ড, পৃ:১৯৯-২০২।)

৪. **মাওলানা আবুল কালাম আযাদঃ** তিনি ১৮৮৮ খৃ: পবিত্র মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট বাবরের আমলে হিরাট অঞ্চল থেকে তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ভারতে আগমন করেন। ১৮৫৭ এর বিদ্রোহের পর তাঁর পিতা মাওলানা খায়রুদ্দীন মক্কায় চলে যান । সেখানে মাওলানা আযাদের জন্ম । তাঁর জন্মের দু'বছর পর তাঁর পিতা সপরিবারে ভারতে চলে এসে কলিকাতায় বসতি স্থাপন করেন। মাওলানা আযাদ শিক্ষালাভ করেন স্বগৃহে পিতা ও গৃহ শিক্ষকের নিকট । ১৯০৫ খৃ: বঙ্গভঙ্গ দ্বারা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা উদ্দীপ্ত হয়। তিনি ইরাক, মিসর, তুরস্ক এবং ফ্রান্সে ব্যাপক সফর করেন। ১৯১২ খৃ: তিনি কলিকাতায় উর্দূ সাপ্তাহিক "আল হিলাল" প্রকাশনা আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৯১৪ খৃ: ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হলে প্রেস এ্যাক্টের অধীনে পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর পর তিনি ১৯১৫ খৃ: কলিকাতা থেকে সাপ্তাহিক "আল-বালাগ" প্রকাশ করেন। তা চলতে থাকে ১৯১৬ খৃ: মার্চ

Dhaka University Institutional Repository

আলীর[১] সাথে সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দেন। এভাবে দু'বছর পর্যন্ত মুসলিম ভারতের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মাওলানা সিন্ধীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়[২]। নাযারাতুল মা'আরিফ প্রতিষ্ঠানটি "কালীদ-এ কুরআন" ও "তা'লীমুল কুরআন" শীর্ষক দু'টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল। গ্রন্থদ্বয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুঁখে দাঁড়ানোর জন্য মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছিল । গ্রন্থ দু'টোকে বৃটিশ ভারত সরকার বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছিল[৩]। পরবর্তীতে শায়খুল হিন্দ মাওলানা সিন্ধীকে বুঝালেন যে, যতদিনে তুমি এই মাদ্রাসার মাধ্যমে ১০/২০ জনকে শিক্ষা দিয়ে নিজের সহকর্মী, সমব্যথী, সহযোদ্ধা ও বৃটিশ বিরোধী করে তুলতে সক্ষম হবে, ততদিনে ইংরেজরা হাজার হাজার ধর্মদ্রোহী ও দেশদ্রোহী তৈরি করে ফেলবে[৪]। বিষয়টির সত্যতা ডব্লিউ

পর্যন্ত । ১৯৪০ খৃ: তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ১৯৪৬ খৃ: পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ খৃ: বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের সাথে আপোষ আলোচনায় তিনি কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেন । পরবর্তীতে স্বাধীন ভারতে প্রথম সরকারের ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৫৮ খৃ: ২২শে ফেব্রুয়ারী মৃত্যু পর্যন্ত সে পদে বহাল থাকেন। (আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলী (অনু), "ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম", (মাওলানা আবুল কালাম আযাদ), স্বপ্নিল প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ:ভূমিকা দ্রষ্টব্য।)

১. **মাওলানা মুহাম্মদ আলী ঃ** ভারতবর্ষের ইতিহাসে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহর একটি সুপরিচিত নাম। একজন প্রতিভাশালী সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বাগ্মী। দেশের স্বাধীনতা ও ইসলামের জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ । ১৮৭৮ খৃ: ১০ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের রামপুর ষ্টেটের এক প্রভাবশালী জায়গীরদার পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুল আলী খান। অল্প বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। নিজ পরিবারে মামুলি উর্দূ -ফার্সী শেখার পর প্রথমে বেরেলী হাই স্কুল, পরে আলীগড় কলেজিয়েট স্কুল ও আলীগড় কলেজে অধ্যয়ন করেন। লন্ডনের অক্সফোর্ড থেকে এম, এ, ডিগ্রী অর্জন করেন। ইংল্যান্ডে চার বছর লেখাপড়া করার পর ১৯০২ খৃ: দেশে ফিরে এসে রামপুর স্টেটের প্রধান শিক্ষা অফিসার পরবর্তীতে বারোদা সিভিল সার্ভিসে যোগদেন। ১৯১১খৃ: তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯১২ খৃ: ন্যাথান নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির অধীনে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্য তালিকা প্রনয়নের জন্য যে ২৫টি উপকমিটি গঠন করা হয়, মাওলানা মুহাম্মদ আলী ছিলেন ইসলামী শিক্ষা উপকমিটির অন্যতম সদস্য। তিনি "ভারতীয় মুসলিমলীগ"-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯০৬খৃ:)। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দেন । ১৯২৩ খৃ: জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন । ১৯৩১ খৃ: লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে তিনি যোগদান করেন। ঐ বছরই তিনি ইংল্যান্ডে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁকে জেরু জালেমে মাসজিদুল আকসার পাশে সমাহিত করা হয়েছে। তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক ইংরেজী "কমরেড" (১৯১০ খৃ:) দৈনিক উর্দূ "হামদর্দ" ছিল বিদেশী শাসন ও শোসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। (আব্দুল্লাহ ,মুহাম্মদ, ডঃ, "মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর", ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ: ১-১১।)

২. "নকশ্-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৪৫।

৩. দৈনিক জমী'অত, দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৬।

৪. নকশ্-এ হায়াত, ২য় খন্ড, পৃ: ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ডব্লিউ হান্টারের বক্তব্য থেকে পাওয়া যায় । তিনি বলেন, " আমাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কলেজ গুলোতে পড়ুয়া হিন্দু -মুসলিম নির্বিশেষে এমন কোন যুবক নেই, যে তাদের মুরুব্বীজনদের বিশ্বাস ও চিন্তা - চেতনাকে মন্দ বলছেনা"[১]। শায়খুল হিন্দ মাওলানা সিন্ধীকে বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত করে নিলেন।

শায়খুল হিন্দ বিশ্বাস করতেন, সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত এদেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশকে হঠানো সম্ভব নয় । তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেন, "হে ভারতবাসী ! জিহাদের মাধ্যমেই জীবন প্রতিষ্ঠিত হয় । যে জাতির মধ্যে জিহাদের স্পিরিট নির্বাপিত হয়েছে, তারাই অপমান-অপদস্ত হয়েছে। দুনিয়ার অন্যান্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তারা পতিত জাতি হিসেবে পরিণত হয়েছে"[২]। সুতরাং তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই বিপ্লব পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়নের জন্য তিনি যে রূপরেখা তৈরি করেছিলেন, তা হলঃ ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ও গোলযোগ সৃষ্টি করা এবং বহির্শক্তি দ্বারা বৃটিশ ভারতে আক্রমণ করে বিপ্লবকে স্বার্থক করা"। শায়খুল হিন্দ মনে করতেন, ভারতের সর্বস্তরের স্বাধীনতাকামী জনগণ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ- বিশেষ করে আফগানিস্তান, ইরান এবং তুরস্কের উসমানীয় খিলাফতকে একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে ইউরোপের (বৃটিশ) উপর আক্রমণ করা ব্যতীত এশিয়াকে ইউরোপের আগ্রাসন থেকে মুক্তকরা সম্ভব হবেনা[৩]। সে উদ্দেশ্যে তিনি একটি কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনঃ তুর্কী সামরিক বাহিনী কাবুলের ভেতর প্রবেশ করে সীমান্ত দিয়ে বৃটিশ ভারতে আক্রমণ করবে। একই সময়ে ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ঘটানো হবে। শায়খুল হিন্দ তাঁর এ সামরিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে দুজন সহকারী নির্বাচন করেন। এঁদের একজন তাঁরই বিশ্বস্ত অনুগত সাগরিদ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, দ্বিতীয় জন মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসূর আনসারী[৪]। শায়খুল হিন্দ মাওলানা সিন্ধীকে ভারতের উত্তর-

---

১. নকশ্-এ হায়াত, ২য় খন্ড, পৃ: ১৪০।

২-৩. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৬।

৪. **মাওলানা মনসূর আনসারীঃ** মাওলানা মনসূর আনসারীর মুল নাম মুহাম্মদ মিয়াঁ আনসারী। সাহারনপুর জেলার ইটা নামক স্থানে তাঁর জন্ম। দারুল'উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষকতা করেন । আজমীরে দারুল'উলূম মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে কিছু দিন কাজ করেন। অত:পর শায়খুল হিন্দের কুরআনের অনুবাদকার্যের সহযোগী নিযুক্ত হন। মাওলানা সিন্ধীর সহকারী হিসেবে "জমী'অতুল আনসার" এ কাজ করেন। একজন দৃঢ় চেতনার সংগ্রামী পুরুষ হিসেবে ভারতীয় বিপ্লবী দলের সদস্য হয়ে শায়খুল হিন্দের সাথে হেযায গমন করেন এবং হেযাযের গর্ভণর গালিব পাশার "গালিবনামা ", মক্কার শায়খুল ইসলামের ফাতাওয়া ও শায়খুল হিন্দের পয়গাম ভারতে বহন করে নিয়ে আসেন এবং এগুলোর ফটোকপি করে ভারতের অভ্যন্তর, সীমান্ত এলাকা ও কাবুলে বিতরণ করেন। আমীর আমান উল্লাহ খানের শাসনামলে নিজস্ব শিক্ষা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বদৌলতে কাবুল সরকারের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ইসলামী রাজনীতি ও প্রশাসন বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। " হুকুমতে ইলাহী" এবং "আসাস-এ ইনকিলাব" তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি ২১ জানুয়ারী ১৯৪৬ খৃ: কাবুলেই ইন্তিকাল করেন। ("নকশ্-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৮৯-১৯১।)

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম সীমান্তে উপজাতীয় স্বাধীন এলাকা সমূহের অবস্থান নিরূপন, যোগযোগের রাস্তা আবিষ্কার[১] সামরিক ছাউনি নিরূপনের নীল নকশা প্রণয়নের দায়িত্ব দেন। সিন্ধী দীর্ঘ সাত বছর পরিশ্রম করে শায়খ মুহাম্মদ ইব্রাহীমের সহযোগিতায় সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন[১]। মাওলানা মনসূর আনসারীকেও তিনি সীমান্তের উপজাতীয়দের মধ্যে জিহাদের চেতনা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণদানের উদ্দেশ্যে সেখানে পাঠান। সীমান্ত এলাকায় শায়খুল হিন্দের অসংখ্য ছাত্র ছিলেন যারা শায়খুল হিন্দের আদর্শে পূর্ব থেকেই অনুপ্রাণিত ছিলেন । উল্লেখ্য, বৃটিশ গোয়েন্দাদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ নিজেকে মনসূর আনসারী নামে পরিচয় দিতেন ।

শায়খুল হিন্দ বৃটিশ ভারতের উপর বহিরাক্রমণ ও দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লব ঘটানো এবং জনগণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের জন্য তৈরি করার উদ্দেশ্যে ভারতের অভ্যন্তরে একটি হেডকোয়ার্টারসহ ৮টি বিপ্লব কেন্দ্র স্থাপন করেন। দিল্লী ছিল ভারতের অভ্যন্তরীণ বিপ্লবী দলের হেডকোয়ার্টার। এর নেতৃত্বে ছিলেন শায়খুল হিন্দ, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী[২], মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মহাত্মাগান্ধী, ডাক্তার মুখতার আহমদ আনসারী, পন্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায় এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ[৩]।

বিদ্রোহের অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রসমূহ ছিল ঃ

১। **রাব্ধেরঃ** রাব্ধের ছিল সুরাট, গুজরাট এবং বোম্বের কেন্দ্র। ঐ কেন্দ্রের নেতা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম[৪]। এছাড়া আহমদ বুর্যুগ প্রমুখ বিপ্লবী কর্মী কর্মরত ছিলেন।

---

১. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৪১।

২. **মাওলানা শওকত আলী** ঃ মাওলানা শওকত আলী ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ১৮৭৩খৃ: রামপুরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম । বেরেলী ও আলীগড়ে লেখা- পড়া সমাপ্ত করে সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। বৃটিশ ভারত কর্তৃক মুসলমানদের স্বার্থকে উপেক্ষা , বঙ্গভঙ্গ রদ, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী প্রত্যাখান , দেশবাসীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি এবং মুসলিম সার্থ বিরোধী বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির কারণে ১৯১২ খৃ: চাকুরী ইস্তফা দেন এবং আযাদী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন । তিনি ১৯০৬ খৃ: ঢাকায় মুসলিম লীগ সংগঠন থেকে শুরু করে ১৯৩৭ খৃ: মুসলিম লীগের অধিবেশন পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতিটি দাবীর প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন জানান। খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে রাজরোষে পতিত হয়ে কিছু দিন কারাবরণ করেন। (বাংলা বিশ্বকোষ , ৪র্থ খন্ড, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ: ৪২৩।)

৩. আব্দুর রহমান, মাওলানা, "তাহরীকে রেশমী রোমাল", লাহোর ক্লাসিক, ১৯৬০, পৃ: ১৫৯।

৪. **মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম রাব্ধেরী** ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম রাব্ধেরী ছিলেন সুরাটের একজন বিখ্যাত আলিম ও মাওলানা সিন্ধীর বন্ধু। একজন মহান বিপ্লবী নেতা, বৃটিশ বিদ্বেষী ও কাবুলের বিপ্লীব দলে যোগদানকারী সদস্য। পূণা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। কাবুলে বৃটিশ

Dhaka University Institutional Repository

২। **পানিপথঃ** পানিপথ ছিল যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত জেলাসমূহের কেন্দ্র। এর নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা আহমদুল্লাহ পানিপথী।

৩। **লাহোরঃ** লাহোর ছিল পাঞ্জাব প্রদেশের কেন্দ্র। এর নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ চাকওয়ালী[১]।

৪। **দীনপুরঃ** দীনপুর ছিল ভাওয়ালপুর স্টেটের কেন্দ্র । এর নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা আবুস্ সিরাজ। তিনি আন্দোলন অপরাধে কারাবরণ করেছেন বটে, কিন্তু বিপ্লবী দলের কোন তথ্য প্রকাশ করেননি।

৫। **ইমরোটঃ** এটি ছিল সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের কেন্দ্র। এর নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা তাজ মাহমূদ। তিনিও কারাবরণ করেছেন, কিন্তু আন্দোলনের কোন তথ্য বৃটিশের নিকট প্রকাশ করেন নি।

৬। **করাচীঃ** এটি ছিল করাচী, কালাত ও লাসবেলার কেন্দ্র । এর নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক। তিনিও কারাবরণ করেছেন, কিন্তু বিপ্লবী দলের কোন তথ্য প্রকাশ করেননি ।

৭। **আতমানযয়ীঃ** এটি ছিল উত্তর সীমান্তের কেন্দ্র। এর নেতৃত্বে ছিলেন খান আব্দুল গাফফার খান [২]

ভারতের বিরুদ্ধে স্থানীয় সরকারকে জিহাদে অনুপ্রাণিত করতে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ১৯১৬খৃ: ১০ জুলাই উপজাতীয় এলাকায় পৌছে বৃটিশের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৪৫ খৃ: তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ("নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ২০৭।)

১. **মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ চাকওয়ালীঃ** মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ চাকওয়ালী ছিলেন পাঞ্জাবের বাসিন্দা এবং দারুল উলূম দেওবন্দের উচ্চতর ডিগ্রীর অধিকারী। শায়খুল হিন্দের অন্যতম শাগরিদ এবং মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর মিশনের একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি ছিলেন আযাদী আন্দোলনে পাঞ্জাবের পাঁচটি শাখারই প্রধান। রেশমী রুমালপত্র ষড়যন্ত্র ফাঁস হবার পর বৃটিশের ব্যাপক ধর-পাকড়ের সময় বৃটিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে ভবিষ্যতে আর রাজনীতি করবেন না শর্তে মুক্তি লাভ করেন। তিনি লাহোরে এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা যান। ("নকশ্-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ২০২।)

২. **খান আব্দুল গাফ্ফার খান** ঃ খান আব্দুল গাফ্ফার খান ১৮৯১খৃ: পেশওয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইতমানযুয়ীর অধিবাসী শীর্ষ স্থানীয় সংগ্রামী পুরুষ। তাঁর বড় ভাই ডা: খান পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বিশ বছর বয়সে শায়খুল হিন্দের হাতে বায়'আত হয়ে জিহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শায়খুল হিন্দের বিপ্লবী দলে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। তিনি হাজী তুরঙ্গজায়ী ও শায়খুল হিন্দের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান করতেন। খান আব্দুল গাফ্ফার খান একজন উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক ও নিখিল ভারতের কংগ্রেস সদস্য ছিলেন । রাওলাট এ্যাকট বিরোধী ও অসহযোগ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে উপমহাদেশের রাজনীতিতে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯২২ খৃ: তিনি তিন বছর সশ্রম কারাদন্ডে সাজাপ্রাপ্ত হন। "খোদায়ী খেদমতগার" নামে একটি স্বেচ্চাসেবক বাহিনী গঠন করেন। তিনি ছিলেন ভারত বিভক্তির বিপক্ষে। ১৯৬৫ খৃ: তিনি চিকিৎসার জন্য লন্ডন গমন করেন। চিকিৎসা শেষে আফগানিস্তানে এসে বাস করতে থাকেন এবং সেখান থেকে পাখতুনিস্তান আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৭১ খৃ: পর তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন। (আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৭; নকশ -এ হায়াত, ২য় খন্ড, পৃ: ১৯৯)

Dhaka University Institutional Repository

(সীমান্ত গান্ধী)। তাঁকে গ্রেফতার করার পর ইংরেজরা তাঁর নিকট থেকে কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারেনি[১]।

৮। **ইয়াগীস্তান**[২] ঃ এটি ছিল শায়খুল হিন্দের বিপ্লবের নির্দিষ্ট কেন্দ্র । সেখানকার অধিবাসীরা কখনো বৃটিশের সামনে মাথা নোয়ায়নি। তারা ছিল নির্ভীক ও সাহসী জাতি। তবে তারা সুশৃংখল ছিল না । পরস্পরে ও গোত্রে গোত্রে মারামারি ও হানাহানি করত। শায়খুল হিন্দ স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বার্থে ইয়াগীস্তান বাসীদের সকল গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লী থেকে মাওলানা সাইফুর রহমান, পেশওয়ার থেকে মাওলানা ফযলে রাব্বী ও ফযলে মাহমূদকে ইয়াগীস্তান প্রেরণ করেন। এছাড়াও ইয়াগীস্তানের মাওলানা মুহাম্মদসহ সেখানকার শায়খুল হিন্দের সাগরিদগণ ইয়াগীস্তানে বিদ্যমান গোত্রসমূহকে ঐক্যবদ্ধ ও বৃটিশ বিরোধী করে তুলতে সক্ষম হন[৩]। শায়খুল হিন্দ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও মাওলানা উযায়রগুলের মাধ্যমে সীমান্তের লৌহমানব, আধ্যাত্মিক মনীষী ও পেশওয়ারের অদ্বিতীয় প্রভাবশালী পীর হাজী তুরঙ্গজায়ী[৪]কে ইয়াগীস্তান আগমন করে জিহাদ পরিচালনার অনুরোধ জানালে, তিনি সেখানে আগমন করেন এবং জিহাদ পরিচালনা করেন। তাঁর আগমনে অসংখ্য মুজাহিদের সমাগম ঘটে। তখন সীমান্তে মুজাহিদগণের বিপুল সমাগম দেখে ইংরেজ সৈন্যরা তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুজাহিদগণও আক্রমণের পাল্টা জবাব দিয়ে কয়েক প্লাটুন বৃটিশ সৈন্যের কবর রচনা করেন[৫]। এসব আক্রমণের জন্য আফগানিস্তান থেকে ব্যাপক অস্ত্রের

---

১. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ২২০ ;'আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬০-১৬৫।

২. **ইয়াগীস্তান:** ১৮৩১ খৃ: বালাকোটের জিহাদের পর ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুজাহিদগণ যে এলাকায় একত্রিত হতেন এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করতেন, সে এলাকাটি ইয়াগীস্তান নামে পরিচিত। ইয়াগীস্তান দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত। যে "সিতানা শিবির" হতে বৃটিশ বাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমন পরিচালনা করা হত তা ইয়াগীস্তানে অবস্থিত। হান্টার নিজেও তার পুস্তকে ইয়াগীস্তান ও সিতানা শিবিরের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এটি মূলত: তদানীন্তন বৃটিশ ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী উপজাতীয় স্বাধীন এলাকা। যেখানে বৃটিশের নিয়ন্ত্রন ছিলনা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে ইয়াগীস্তানের "সিতানা ক্যাম্প" উল্লেখযোগ্য স্থান। ("নকশ্ -এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৪২,১৮১-১৮২; আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৩।)

৩. মুহাম্মদ মিয়াঁ, সায়্যিদ, "আসীরানে মাল্টা", আল-জমইয়্যাত বুক ডিপো, দিল্লী, ১৯৭৬, পৃ: ৩১-৩৩।

৪. **হাজী তুরঙ্গজায়ী** ঃ সীমান্তের লৌহমানব, ইংরেজ ত্রাস দুর্ধর্ষ পাঠান অথচ নিরীহ সাধারণ চেহারার অধিকারী হাজী তুরঙ্গজায়ী পেশওয়ার জেলার চারসিদ্দা থানার তুরঙ্গজায়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম হাজী ফযলে ওয়াহিদ। তিনি একজন মুত্তাকী, পরহিজগার, বিচক্ষণ আলিম ও তরীকতের প্রসিদ্ধ শায়খ ছিলেন । বিখ্যাত পীর শাহ নাজমুদ্দীনের খলীফা ছিলেন । ইয়াগীস্তান ও সীমান্ত এলাকায় তাঁর অসংখ্য মুরীদ ও সাগরিদ ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামচেতনা তাঁর শিরায় শিরায় প্রবাহমান ছিল। তিনি ইয়াগীস্তান থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। ("নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ:১৮১-১৮২;'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৩।)

৫. "আসীরানে মাল্টা", পৃ: ৩১-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্য পাওয়া গেলেও মুজাহিদগণের রসদ ও গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেলে, তা যোগাতে হত শায়খুল হিন্দকে ভারত থেকেই অথবা মুজাহিদগণকে এসব সংগ্রহরে জন্য যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে বাইরে যেতে হত [১]। হাজী তুরুঙ্গজায়ী পরিচালিত মুজাহিদ আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা চিরঅভিশপ্ত ভেদনীতি বা "ডিভাইড এন্ড রুলনীতি" প্রয়োগের মাধ্যমে মুজাহিদগণের আক্রমণ বানচালের অপকৌশল অবলম্বন করে । ইংরেজরা এজন্য আফগান আমীর হাবীবুল্লাহ খানকে প্রচুর অর্থ প্রদান ও তাঁর পুত্র 'ইনায়াত উল্লাহ খানকে ভবিষ্যৎ আফগান সিংহাসনে বসানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে পাঠান সর্দারদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে সক্ষম হয় । ফলে হাজী তুরঙ্গজায়ীর সৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে [২]। তখন ইয়াগীস্তানের নেতৃবৃন্দ শায়খুল হিন্দকে সেখানে যেয়ে উপজাতীয়দের বিভেদ মিটিয়ে জিহাদের জন্য পুনরায় উদ্বুদ্ধ করার আবেদন জানালেন এবং মুজাহিদগণের রসদ ও গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেছে সে সংবাদও জানালেন; যে গুলোর যোগান দেয়া শায়খুল হিন্দ ব্যতীত সম্ভব নয়[৩]। এ পরিস্থিতে জনসাধারণের সামান্য আর্থিক সাহায্য দ্বারা দীর্ঘ মেয়াদী জিহাদের বিশাল ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয় ভেবে শায়খুল হিন্দ ও ভারতীয় বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি শায়খুল হিন্দের দেওবন্দের বাসভবনে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আগামী ১৯১৭ খৃঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী পূর্ব পরিকল্পিত বিপ্লব ঘটাতে হবে। আর সে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন, ইতিপূর্বে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে তুর্কী ও আফগান সরকারের সাথে ভারতীয় বিপ্লবী দলের যে গোপন চুক্তি হয়েছিল; সেগুলো সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে নেয়া। চুক্তিসমূহ বাস্ত বায়নের রূপরেখা ছিলঃ "শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান নিজে মক্কা হয়ে তুরস্কে যাবেন এবং তুর্কী সরকার কর্তৃক চুক্তির অনুমোদন নিয়ে কাবুলে আসবেন এবং কাবুল সরকারের পক্ষ থেকে ঐ চুক্তির অনুমোদন নিয়ে সে সম্পর্কে তুর্কী সরকারকে অবহিত করাবেন। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ভারতের উপর আক্রমণ করবে"। সে কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে আফগানিস্তানে প্রেরণ করা হবে[৪]।

ভারতীয় বিপ্লবী দলের আর্ন্তজাতিক বিপ্লব কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠ হয়েছিল। ঐ কেন্দ্র সমূহ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, আর্ন্তজাতিকভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে বৃটিশ বিরোধী মনোভাবকে চাঙ্গা করা, আর্ন্তজাতিকভাবে জনগণকে অনুপ্রাণিত করা এবং এর জন্য অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা। আর্ন্তজাতিক কেন্দ্র সমূহের হেড কোয়ার্টার ছিল কাবুল। প্রথমে এর পরিচালনায় ছিলেন রাজা

---

১. ঐ, পৃঃ ৩১-৩৩।

২. ঐ, পৃঃ ৩২-৩৩; তাহির, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯-১০।

৩. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৮৬।

৪. আব্দুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮১-১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

মহেন্দ্র প্রতাপ[১]। পরবর্তীতে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও মহেন্দ্র প্রতাপ যুগ্নভাবে এর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। কাবুল হেডকোয়ার্টারে তত্ত্বাবধানে পাঁচটি কেন্দ্র ছিল। ১. মদীনা, ২. ইস্তাম্বুল, ৩. কনস্টান্টিনোপল, ৪. আঙ্কারা ও ৫. বার্লিন[২]।

(গ) কাবুলে হিজরত ও অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা

শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান ১৯১৭ খৃঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী বৃটিশ ভারতের উপর আক্রমণের যখন ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ খৃঃ) শুরু হয়ে যায়। যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯১৮ খৃঃ ১১ নভেম্বর। ১৯১৪ খৃঃ ১৮ জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে সূচনা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। যুদ্ধে বৃটিশ জোটবদ্ধ মিত্র শক্তির মধ্যে ছিল ফ্রান্স, ইটালি, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সার্ভিয়া, মন্টেনিগ্রো ও জাপান। অপর দিকে জার্মান জোটভুক্ত অক্ষ্য শক্তিবর্গের মধ্যে ছিল অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী। পরবর্তীতে জার্মানীর পক্ষে যোগ দেয় তুরস্ক। এ যুদ্ধ ইউরোপ থেকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে । বিভিন্ন রণাঙ্গনে বৃটিশ সৈন্য বাহিনী প্রেরিত ও সম্প্রসারিত হয়। তখন ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন দেশে ভারতীয় প্রবাসীরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তাই বৃটিশ ভারত সরকার ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ধর-পাকড় আরম্ভ করে এবং কাউকে নজরবন্দি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পরই শায়খুল হিন্দ এবং বিপ্লবী আলিমগণ ভাবলেন, ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ঘটানো এবং বর্হিশক্তি দ্বারা বৃটিশ ভারতের উপর আক্রমণের এটা মোক্ষম সুযোগ[৩]। তাই শায়খুল হিন্দ আফগানিস্তানে উপনীত ভারতীয় মুজাহিদগণের নেতৃত্ব দান, সেখানে অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও কাবুল সরকাররের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে বললেন, " তুমি কাবুলের পথ ধর আর আমি হেযাযের পথ ধরছি। মাওলানা সিন্ধী এ আদেশ পেয়ে ১৯১৫ খৃঃ এপ্রিলে দিল্লী ত্যাগ করে সিন্ধুতে চলে যান । সেখানে যেয়ে তিন- চার মাস পর্যন্ত কাবুলের পথ-ঘাট, সুবিধা- অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে খুঁজ নেন এবং বৃটিশ গোয়েন্দাদের কিভাবে ফাঁকি দেয়া যায়, সে বিষয়ে ভাবতেন থাকেন[৪]। অবশেষে একদিন তিনি শায়খ আব্দুর

---

১. **রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ** ঃ রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ১৯১৪ খৃঃ ভারতের পাসর্পোটে সুইজারল্যান্ড, ইটালী ও ফ্রান্সের ভিসা নিয়ে সোজা জেনেভা চলে যান এবং সেখানে বিদ্রোহী নেতা হরদয়ালের সাথে একত্রিত হয়ে জার্মান মিশনের সাথে আফগানিস্তান গমন করেন এবং আফগানিস্তানের অস্থায়ী ভারত সরকারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ("নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৬৫)

২. ৮আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৬।

৩. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪১ ; "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬।

৪. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

রহীম সিন্ধী[১]কে সাথে নিয়ে কাবুলের পথ ধরেন। শায়খ আব্দুর রহীম মাওলানা সিন্ধীকে সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসেন । সিন্ধী আব্দুল্লাহ, ফাতিহ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ আলী এই তিনজনকে সাথে নিয়ে বেলুচিস্তানের মরুপথ, ভয়াল নির্জন পাহাড়, জঙ্গল ও পাহাড়ী উপত্যকা পাড়ি দিয়ে ইয়াগীস্তান হয়ে বিনা পাসপোর্টে কাবুল যাত্রা করেন[২] এবং ১৯১৫ খৃঃ ১৫ আগষ্ট আফগান সীমান্তে পৌছে একটি স্বাধীন ভূমিতে মাগরিবের নামায আদায় করেন। অতঃপর ১৫ অক্টোবর কাবুলে উপনীত হন [৩]। সিন্ধী যে এলাকা দিয়ে আফগানিস্তান পৌঁছেন সে এলাকার নাম "সুরাবুক"[৪]। তিনি আফগানিস্তানে ঢুকতে প্রথমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতীয়দের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী বিদ্বেষ ছড়াতে সক্ষম হন । রাস্তায় গজনীতেও তিনি অবস্থান করেন[৫]। পথিমধ্যে আফগানিস্তানের স্থানীয় সরকারগুলো তাঁকে সহায়তা করেন। কাবুলে পৌঁছে তিনি অনেক স্বাধীনতাকামীদের দেখতে পান। তাঁরা আগে থেকেই সিন্ধীর আগমন বিষয়ে অবগত ছিলেন। স্বরণযোগ্য, যে স্বাধীনতা অর্জন উদ্দেশ্যে মাওলানা সিন্ধী ১৯১৫ খৃঃ ১৫ আগস্ট আফগানিস্তানের স্বাধীন ভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন, সেই ১৫ আগস্ট (১৯৪৭ খৃঃ) ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল ।

এটা স্পষ্ট কথা যে, মাওলানা সিন্ধীর কাবুল গমন ছিল একটি দুঃসাহসিক অভিযান। বৃটিশ গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ণ নজর, ধর-পাকড়ের আশংকা এবং পদে পদে ছিল কঠিন বিপদ ও মৃত্যুর বিভীষিকা । যেহেতু সিন্ধীর কাবুলে পৌছার আগেই কয়েকজন ভারতীয় একটি রাজনৈতিক অভিযোগে সেখানে গ্রেফতার হয়েছিলেন । কিন্তু সিন্ধী সাহস হারাননি; বরং আল্লাহর উপর ভরসা করে যাত্র শুরু করেছিলেন[৬]। যেহেতু মাওলানা সিন্ধীর পেছনে বৃটিশ গোয়েন্দা সর্বদা পিছু লেগে থাকত, তাই শায়খুল হিন্দ মাওলানা সিন্ধীকে কোন প্রোগ্রাম সর্ম্পকে বিস্তারিত কিছু বলতেন না। তা সত্ত্বেও তিনি বিস্তারিত বুজতে সক্ষম হতেন এবং যে কোন সংকট মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। সিন্ধী তাঁর কাবুল সফর সর্ম্পকে বলেন, " ১৩৩৩ হিঃ/

---

১. **শায়খ আব্দুর রহীম সিন্ধীঃ** শায়খ আব্দুর রহীম সিন্ধী ছিলেন একজন নওমুসলিম । ইসলামের সত্যতায় প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন । মিস্টার আচার্য কৃপালণী ছিলেন তাঁরই ছোট ভাই। তাঁর হাতে অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে ডাঃ শামসুদ্দীন আহমদ উল্লেখযোগ্য । আব্দুর রহীম শায়খুল হিন্দের একজন নির্ভরযোগ্য কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর একজন সহকারী হয়ে কাজ করেন। তিনি আন্দোলনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের কাজ করতেন। নিজের স্ত্রী-কন্যাদের গয়নাপাতি বিক্রি করে মাওলানা সিন্ধীর আফগান সফরের খরচ যুগিয়ে ছিলেন। রেশমী রুমালপত্র ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেলে পুলিশের গ্রেফতারী এড়ানোর জন্য তিনি আত্মগোপন করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সেরহিন্দে অসুস্থ হয়ে মারা যান। ("নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৯৪-১৯৫; "দৈনিক জমিয়ত", প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৭।)

২. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪৩।

৩-৫. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৭ ; নকশ-এ হায়াত, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪৮-১৪৯।

৬. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪৩, ১৪৬।"দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৫ খৃঃ আগস্টে শায়খুল হিন্দের নির্দেশে আমি কাবুল গমন করি । তবে শায়খুল হিন্দ কাবুলের বিস্তারিত কর্মসূচী আমাকে বলেননি, তাই প্রথমে কাবুলে যাওয়ার বিষয়টি আমার নিকট ভাল লাগেনি। কিন্তু শায়খুল হিন্দের নির্দেশে যেতে হয়েছিল । আল্লাহ পাকের অসীম দয়া-অনুকম্পা যে, ভারত থেকে বের হবার রাস্তা আমার জন্য পরিস্কার হয়ে গেল এবং আমি আফগানিস্তান পৌছে গেলাম । রওয়ানা হবার সময় দিল্লীর রাজনৈতিক নেতা -কর্মীদের জানিয়ে দিলাম, আমার কাবুল যাবার বিষয়টি চুড়ান্ত হয়ে গেছে। তাঁরাও আমাকে তাঁদের প্রতিনিধি মনোনীত করলেন। তবে কোন যুক্তিসংগত প্রোগ্রামের বিষয়ে তারাও আমাকে বলতে পারেননি। কাবুলে পৌছে আমার বুঝে আসল, হযরত শায়খুল হিন্দ যে জামা'আতের প্রতিনিধি ছিলেন সেই জামা'আতের পঞ্চাশ বছরের পরিশ্রমে অর্জিত সব কিছু অবিন্যস্তভাবে আমার সামনে দিক নিদের্শনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। শায়খুল হিন্দের দৃষ্টিতে এসবের জন্য আমার ন্যায় একজন খাদেমের প্রয়োজন ছিল। তাই আমার কাবুল আগমন এবং শায়খুল হিন্দ কর্তৃক আমাকে একাজের জন্যে নির্বাচিত করায় আমার মধ্যে গৌরব অনুভব হতে লাগল"[১] ।

অপরদিকে শায়খুল হিন্দের বিপ্লবী মিশনের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর গ্রেফতারের আশংকা বেড়ে গেল। ডাঃ মুখতার আহমদ আনসারী তাঁর গ্রেফতারের সরকারী সিদ্ধান্ত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অবহিত হতে পেরেছিলেন। সে প্রেক্ষিতে শায়খুল হিন্দ বিপ্লবী দলের তুর্কী চুক্তি ও তুর্কী-আফগান চুক্তি পুনরায় পাকাপোক্ত করে চুড়ান্ত বিপ্লব ঘটানোর জন্য তুরুস্কে যাবার উদ্দেশ্যে হেযাযের অভিমুখে যাত্রা করেন ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ খৃঃ। ডাঃ আনসারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আগে থেকেই বোম্বে অবস্থান করে টিকিট ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন । ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ খৃঃ আকবর স্টীমারে করে জেদ্দার উদ্দেশ্যে তিনি বোম্বে ত্যাগ করেন[২]। তখন শায়খুল হিন্দের সফরসঙ্গী ছিলেন মাওলানা মুরতাযা হাসান চাঁদপুরী, মাওলানা মুহাম্মদ সহূল ভাগলপুরী, মৌলবী মুহাম্মদ আম্বুঠী, মৌলবী উযায়রগুল, হাজী খান মুহাম্মদ, মৌলবী মাতলূবুর রহমান দেওবন্দী, হাজী মাহবূব খান সাহারনপুরী, হাজী আব্দুল করীম, ওয়াহীদ আহমদ প্রমুখ[৩]। এদিকে ইউ, পি'র গর্ভণর শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতার করার জন্য বোম্বে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রেরণ করে। তবে গ্রেফতারী পরোয়ানা সেখানে পৌঁছার আগেই জেদ্দার উদ্দেশ্যে স্টীমার বোম্বে বন্দর ত্যাগ করে। তাই বোম্বে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে পারেনি। উপায়ন্তর না দেখে ইউ, পি গর্ভণর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক "আদন"-এর গর্ভণরের নিকট তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানা ——————

---

১. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪৩, ১৪৬।"দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ:২২৭।

২-৩. হুসাইন আহমদ মাদানী,"সফরনামা-এ আসীরে মাল্টা", মাকতবাতিল ফাদলি, দেওবন্দ, তা: বি:,পৃ:১৫-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেরণ করে । কিন্তু ডাঃ আনসারীর লোকজনদের সহায়তায় স্টীমার আদন বন্দর ত্যাগ করার পর গ্রেফতারী পরোয়ানা সেখানে পৌছলে তারা তাঁকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অবশেষে স্টীমারের ক্যাপ্টেনকে টেলিগ্রাম মারফত শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেসময় হেযায সরকার স্টীমারের যাত্রীদেরকে "সা'আদ" দ্বীপে নামিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় জেদ্দায় পৌছানোর ব্যবস্থা করতেন। শায়খুল হিন্দ সা'আদ দ্বীপে অবতরণ করার পর ক্যাপ্টেনের নিকট গ্রেফতারী পরোয়ানা পৌছে । তাই সে তাঁকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এ ভাবে শায়খুল হিন্দ তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে মক্কায় পৌছেন[১]।

মাওলানা সিন্ধীর আফগানিস্তান সফরের উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য আফগানিস্তান থেকে নৈতিক সমর্থন ও সামরিক সাহায্য আদায় করা[২]। তাই ১৯১৫ খৃঃ ১৫ অক্টোবর কাবুলে পৌছে তিনি শায়খ ইব্রাহীমের বাসস্থানের নিকট একটি বাড়ীতে অবস্থান করেন । শায়খ ইব্রাহীমের সহায়তায় তিনি সেনাপতি মুহাম্মদ নাদির খান এবং সর্দার মাহমূদ খান তরযীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আফগানিস্তানের ইসলামী শরী'অতের বিচার বিভাগের প্রধান বিচারপতি আব্দুর রায্যাক- এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। বিচারপতি আব্দুর রায্যাক ছিলেন দারুল'উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর ছাত্র। তিনি মাওলানা সিন্ধীর কাবুল গমনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁকে মোবারকবাদ জানান[৩]। সিন্ধী তাঁদের সহায়তায় আফগান সরকারকে তাঁর পরিকল্পনা বিষয়ে সম্মত করার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং আফগান সরকার প্রধানের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করেন। আফগান বাদশাহ আমীর হাবীবুল্লাহ খান[৪]-এর পুত্র মু'য়িনুস্ সুলতানাত সর্দার ইনায়াত উল্লাহ খান, নায়িবুস্ সুলতানাত সর্দার নসরুল্লাহ খান (আমীর হাবীবুল্লাহ খানের ভাই) ও আমীর হাবীবুল্লাহ খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নিজের আগমনের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে সাত-আট পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে তাঁদেরকে অবগত করেন[৫]। এতে আমীর হাবীবুল্লাহ খান যথেষ্ট প্রভাবিত হন এবং সিন্ধীর কথাবার্তা ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হন। তিনি সিন্ধীকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাবার জন্য নির্দেশ দেন। তবে সিন্ধীকে হিন্দুদের

---

১. "আসীরানে মাল্টা", পৃ: ৩৭।

২. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৭।

৩. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৫০-১৫২।

৪. **আমীর হাবীবুল্লাহ খানঃ** আমীর হাবীবুল্লাহ খান (১৮৭২-১৯১৯খৃ:) ছিলেন আমীর আব্দুর রহমানের পুত্র। ১৯০১ খৃ: ১অক্টোবর থেকে ১৯১৯খৃ: ২০ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আফগানিস্তানের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৯১৯ খৃ: ২০ ফেব্রুয়ারী জালাবাদের নিকট গোশ নামক কেল্লায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন । তিনি ছিলেন বৃটিশ সমর্থক ও অনুগত। ভারতীয় বিপ্লবী দলকে "অস্থায়ী ভারত সরকার" গঠনের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তবে তুর্কী বাহিনীর কাবুলের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ভারতে আক্রমণ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকলেও এ পরিকল্পনা বৃটিশকে জানিয়ে দেন। এতে মাওলানা সিন্ধীর কাবুল গমনের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যাহত হয়। ("নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৭২-১৭৪ ।)

৫. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৫০-১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে মিলে-মিশে কাজ করার জন্য হুকুম দেন[১]। সিন্ধী বলেন, " সে আদেশমতে কাজ করার শুধুমাত্র একটি পন্থাই ছিল। তা হল, "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস"-এ যোগদেয়া। এরপর থেকে আমি ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে কাজ করতে থাকি [২]।

মাওলানা সিন্ধী কাবুলে পৌছার আগেই তুর্কী-জার্মানের একটি মিশন ১৯১৫খৃঃ ২৬ সেপ্টেম্বর কাবুলে পৌছেছিল । তুর্কী-জার্মান মিশন আমীর হাবীবুল্লাহ খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বিস্তারিতভাবে কথা বলেন [৩]। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যেসব ভারতীয় নাগরিক ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছিলেন, তারা সবাই বার্লিনে একত্রিত হন এবং ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ বিতাড়ণ উদ্দেশ্যে জার্মান সরকারের সাথে আঁতাত করেন। এই আঁতাতে তুরস্কও যোগ দেয়। এ সময় লালা হরদয়ালের নেতৃত্বে মৌলবী বরকত উল্লাহ ভূপালী[৪], ডঃ তরক দাস ও চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর সহযোগিতায় জার্মান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অধীন "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি" নামক একটি দল গঠন করা হয়। তারা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও মৌলবী বরকত উল্লাহ ভূপালীর নেতৃত্বে ঐ মিশনটিকে কাবুলে পাঠিয়েছিলেন[৫]। ঐ মিশনের উদ্দেশ্য ছিল, আফগান সরকারের সামরিক সাহায্যের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তায় নেয়া অথবা আফগান সরকারকে বৃটিশ বিরোধী গড়ে তোলা। তার সাথে তুরস্কের সামরিক সাহায্যের মাধ্যমে বৃটিশ ভারতে আক্রমণ করা । যেহেতু তুরস্ক ও জার্মানের সৈনিকরা তুরস্ক ও ভারতবর্ষের মাঝে ইরান ও আফগানিস্তান অবস্থিত হওয়ার কারণে সরাসরি ভারতে প্রবেশ করতে পারছিলনা, তাই ইরান ও আফগানিস্তানের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি আবশ্যক হয়ে পড়ে। ইরান ছিল বৃটিশ শক্তি দ্বারা প্রভাবিত। তাই তাদের জন্য ইরানের উপর দিয়ে বৃটিশ ভারতে আক্রমণ করা ছিল কষ্টসাধ্য বিষয়। অপরদিকে জার্মান সরকার মনে করছিলেন, যদি আফগানিস্তান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে হয়ত বৃটিশকে নিজেদের সৈন্যবাহিনীর এক বিশাল অংশ ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে সরিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম

---

১. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৫০-১৫২।

২. আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০৭।

৩. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৫৩।

৪. **মৌলবী বরকত উল্লাহ** ঃ মৌলবী বরকত উল্লাহ ভূপালী ছিলেন ভূপাল স্টেটের অধিবাসী। তিনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও জাপান ভ্রমণ করেন। টোকিওতে তিনি হিন্দুস্তানী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। সেখানে তিনি "The Islamic Fraternity" নামক একটি বৃটিশ বিরোধী পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। পত্রিকাটি তখন সরকার কর্তৃক বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তাঁকে অধ্যাপনার চাকুরি থেকেও বরখাস্ত করা হয়। এর পর তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্যে গঠিত আমেরিকার "গদর পার্টি"তে (বিদ্রোহীদল) যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি আমেরিকা থেকে বার্লিনে পৌছেন এবং হরদয়ালের নির্দেশে সেখান থেকে কাবুলে এসে উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর সংগে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করেন। তিনি ঐ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন । (আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, ডঃ, "মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ঃ জীবন ও কর্ম", ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ: ১২।)

৫. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

সীমান্তে মোতায়েন করতে হবে। এতে তারা একটি সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে । তুর্কী-জার্মান মিশনে সাতজন জামার্নী ও একজন তুর্কী সামরিক অফিসার অংশ নিয়েছিলেন। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় সৈন্যরা যাঁরা জার্মানের জেলে বন্দী ছিলেন এবং যাঁরা দেশ প্রেমের অভিযোগে চাকুরিচ্যুত হয়ে জার্মান চলে গিয়েছিলেন, তারাও ঐ মিশনের সাথে বার্লিন থেকে কাবুলে চলে এসে ছিলেন[১]। আফগানিস্তান বৃটিশ শক্তি দ্বারা প্রভাবিত থাকলেও সাধারণ জনগণ বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদগ্রীব ছিল। আমীর হাবীবুল্লাহ খান ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার কারণে তাঁর দেশকে যুদ্ধকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তুর্কী- জার্মান মিশন আমীর হাবীবুল্লাহ খানকে যুদ্ধের আবেদন জানালে তিনি যুদ্ধ বিষয়ে পরামর্শের জন্য দেশের সর্বস্তরের জনগণকে আমন্ত্রণ জানান। এতে আপামর নেতৃবৃন্দ, অফিসারবৃন্দ, এমনকি নসরুল্লাহ খান এবং আমান উল্লাহ খান[২]ও বৃটিশ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। শুধু মাত্র আমীর হাবীবুল্লাহ খান ও ইনায়াত উল্লাহ খান যুদ্ধের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। যুদ্ধের স্বপক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠের এ মতামত দেখে আমীর হাবীবুল্লাহ খান যুদ্ধের পক্ষে - বিপক্ষের মাঝামাঝি একটি প্রস্তাব পেশ করেনঃ নির্দিষ্ট কয়েকটি পাহাড়ী এলাকা দিয়ে তুরস্ক বাহিনী বৃটিশের উপর আক্রমণ করবে, আফগান সৈন্যরা তাতে অংশ গ্রহণ করবেনা, তবে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় জান-মাল কুরবানী করতে পারবে। তবেও কাবুল সরকার বৃটিশ ভারতের উপর আক্রমণ করতে রাজি হয়নি[৩]। মোটকথা জার্মান মিশন নিজেদের উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। আফগান সরকারকে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে পারেনি[৪]।

মাওলানা সিন্ধী কাবুলে পৌছে আমীর হাবীবুল্লাহ খানের সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেন এবং জার্মান- তুর্কী মিশনের সাক্ষাৎ ও তাদের সাথে কাজ করার অনুমতি লাভ করেন । মূলতঃ মাওলানা সিন্ধী এমন একটি সময়ে কাবুল পৌছেন, যখন জার্মান-ইন্ডিয়ান

---

১. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৮।

২. **আমীর আমান উল্লাহ খান** ঃ আমীর আমান উল্লাহ খান (১৮৯২-১৯৬০খৃ:) ছিলেন আফগানিস্তানের আমীর ও বাদশাহ। পিতা আমীর হাবীব উল্লাহ খান। তিনি পিতৃব্য নসরুল্লাহ খানকে সিংহাসনচ্যুত করে ক্ষমতায় আরোহন করেন। জনমতের চাপে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তৃতীয় ইঙ্গ- আফগান যুদ্ধ (১৯১৯ খৃ:) সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে আফগানরা জয়ী হয়। ১৯২৭ খৃ: আমান উল্লাহ স্ত্রীসহ ইউরোপে ভ্রমণ করেন এবং সেখান থেকে ১৯২৮ খৃ: দেশে ফিরে বলপূর্বক আফগানদের উপর ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরাবার ও পর্দাপ্রথা বিলোপ করার চেষ্টা করেন। ফলে সমগ্র দেশে বিদ্রোহ শুরু হয়। অবশেষে জনরোষে পরে ১৯২৯ খৃ: তিনি ইনায়াততুল্লাহ্ খানের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করে ইউরোপ গমন করেন। সুইজারল্যান্ডে নির্বাসিত জীবন যাপনকালে যুরিখে তাঁর মৃত্যু হয়। (বাংলা বিশ্বকোষ , ১ম খন্ড, ১৯৭৩, পৃ: ১৯৪।)

৩. [৮]আব্দুর রহমান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৮।

৪. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

ন্যাশনাল সোসাইটি ও জার্মান-তুর্কী সরকারের সম্মিলিত মিশন কাবুলে পৌছে ছিল। অপর দিকে শায়খুল হিন্দের আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে সিন্ধী কাবুলে পৌছেন[১]।

মাওলানা সিন্ধী কাবুলে আগত তুর্কী- জার্মান মিশনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মিশন ও মিশনের অন্যান্য সাথী- কর্মীদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ বিতাড়ণের পর সেখানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা নিজেদের হাতে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন । এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিপ্লবী কাউন্সিলের এক অধিবেশন ১৯১৫ খৃঃ ২৯ অক্টোবর বিচারপতি আব্দুর রায্যাক খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সে অধিবেশনে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । ইতিহাসে ইহা "অস্থায়ী ভারত সরকার" নামে খ্যাত । আফগান সরকার অস্থায়ী সরকারের অফিসের জন্য কয়েকটি সরকারী বাসভবন প্রদান করেন । ১৯১৫ খৃঃ ১ ডিসেম্বর "অস্থায়ী ভারত সরকার"-এর ঘোষণা দেয়া হয়। এই অস্থায়ী ভারত সরকারে ভারতের উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার অধিবাসী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব গৃহীত হয় । মহেন্দ্র প্রতাপের উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে জার্মান মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে কাবুলে আগত মৌলবী বরকত উল্লাহ ভূপালীকে প্রধান মন্ত্রী এবং মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়[২]। ঐ সরকারে কয়েকজন জার্মান ও তুর্কী মিশনের সদস্য ছিলেন। দেশত্যাগী মুজাহিদ ছাত্ররাও ঐ অস্থায়ী সরকারের সাথে যোগদেন[৩]। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ নিজেই অস্থায়ী সরকারের আইন রচনা করেছিলেন। শুরুতে তিন সদস্য বিশিষ্ট সরকার গঠিত হয়। পরবর্তীতে এর সংখ্যা বদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারীতে লাহোরের বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত ১৫ জন বিপ্লবী মুসলিম ছাত্র ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পার হয়ে প্রথমে স্বাধীন সীমান্ত এলাকায় চলে যান এবং সেখান থেকে কাবুলে উপনীত হন। তখন আমাদের সীমান্তগুলো বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত কঠোরভাবে সংরক্ষিত ছিল। তা সত্ত্বেও দেশত্যাগী ছাত্ররা সীমান্ত পার হতে পেরেছিলেন। উল্লেখিত ১৫জন ছাত্রকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে "পলাতক ছাত্র" বা "মুজাহিদ ছাত্র" বা "দেশত্যাগী ছাত্র" আখ্যায়িত করা হয়েছে[৪]। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, ভারত সীমান্তে বৃটিশের বিরুদ্ধে হামলা করা। তা সম্ভব না হলে তুরস্কে যেয়ে তুরস্কের পক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করা[৫]। এ দেশত্যাগী ছাত্ররা হলেন, ১.[৬]আব্দুল বারী, ২.[৬]আব্দুল কাদির, ৩.[৬]আব্দুল মজীদ খান, ৪. আল্লাহ নেওয়াজ খান, ৫.[৬]আব্দুল্লাহ, ৬.[৬]আব্দুর রশীদ, ৭. গোলাম হুসাইন, ৮. জাফর হাসান, ৯. আব্দুল খালিক, ১০. মুহাম্মদ হাসান, ১১. খুশী মুহাম্মদ ওরফে মুহাম্মদ আলী, ১২.[৬]আব্দুল হামীদ, ১৩. রহমত আলী,

---

১. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৮।

২-৩. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৬৫,১৬২; আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯-১১০।

৪. মোদাব্বের, মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪।

৫. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. শুজা উল্লাহ ও ১৫. আব্দুল্লাহ আল্লাহ নেওয়াজ খান[১]। এঁদের দেশত্যাগের ব্যবস্থা করেছিলেন শায়খ আব্দুর রহীম সিন্ধী। কিন্তু তারা বিষয়টি জানতনা [২]।

তবে দুঃখের বিষয়, জার্মান - তুর্কী মিশনের সদস্য ও ভারতীয় দলের সদস্যগণের মধ্যে অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর মিশনের কর্মসূচী নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় । মাওলানা সিন্ধী ঐ মতানৈক্য দূর করার চেষ্টা করেন। ঐ মতানৈক্যের মূল কারণ ছিল, হিন্দু-মুসলিম দ্বন্ধ। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ছিলেন ঘোর সাম্প্রদায়িকতাবাদী [৩]। তিনি মনে করতেন, ভারতবর্ষে হিন্দুদের প্রাধান্য ও সংখ্যা গরিষ্ঠতা রয়েছে। সুতরাং মিশনে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার রয়েছে তাদেরই। কিন্তু মুসলমান প্রতিনিধিগণ সে প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি। মাওলানা সিন্ধী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের উপর প্রভাব বিস্তার করতে এবং তাঁকে সদলে আনতে সমর্থ হন। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সাথে একটি সমঝোতায় উপনীত হন এবং তাকে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতে বাধ্য করেন[৪]। সিন্ধী জার্মান মিশন ও ভারতীয়দের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করে আফগান আমীরের সামনে যুক্তিযুক্ত কর্মসূচী পেশ করেন এবং বৃটিশ ভারতে আক্রমণ বিষয়ে আবেদন জানান[৫]। কিন্তু আফগান বাদশাহ হাবীবুল্লাহ তাঁদের এ মতানৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করেন। সে সুযোগে অস্থায়ী ভারত সরকার ও মিশনের অনেক আবেদন কৌশলে এড়িয়ে যান। যেমনঃ তুর্কী- জার্মান মিশন আফগান সরকারকে রাশিয়ার জার সম্রাট ও বৃটিশের সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করার, বৃটিশের বিরুদ্ধে মিশনকে সামরিক সাহায্য করার এবং বৃটিশ ভারতে আক্রমণ করার প্রস্তাব জানিয়ে স্বর্ণের পাতে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে অস্থায়ী ভারত সরকারের পক্ষ থেকে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ স্বাক্ষর করেন ; কিন্তু আফগান সরকারের পক্ষে বাদশাহ হাবীবুল্লাহ খান স্বাক্ষর করা থেকে এই বলে বিরত থাকেন যে, "বৃটিশ ভারতের উপর আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে আক্রমণ করার প্রস্তাব কার্যকর করতে হলে ভারতীয় উচ্চ পদস্ত রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সন্ধির প্রয়োজন । আর সেজন্য মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মতিলাল নেহেরুর ন্যায় প্রথম সারির নেতাদের আফগানিস্তানে আসার প্রয়োজন"[৬]। তুর্কী - জার্মান মিশন ও ভারতীয় প্রতিনিধিগণ আমীর হাবীবুল্লাহ খানকে সেধরনের আশ্বাস দিতে ব্যর্থ হলে তাদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। মোট কথা মিশনের প্রতিনিধিগণের মতানৈক্য ও দ্বন্ধকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে আমীর হাবীবুল্লাহ একটি রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করেন[৭]। আমীর হাবীবুল্লাহ মাওলানা সিন্ধী ও তাঁর সহকর্মীগণকে যথেষ্ট সুযোগ দান করলেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে

---

১. যাফর হাসান আইবেক, "আপবীতী", মনসূর বুক হাউজ, লাহোর, ১৯৬৮, পৃ: ২৩।

২. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৮।

৩. তাহির, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১।

৪-৫. "নকশ- এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৬৫ ।

৬-৭. আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধ করার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না[১]। যেহেতু আমীর হাবীবুল্লাহ ছিলেন বৃটিশ অনুগত; বরং বৃটিশ আশ্রিত। এমনকি আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি ছিল বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত । বৃটিশের পরামর্শ ব্যতীত তাঁর নড়বার সাধ্য ছিল না। তাই বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে ইতস্ততা দেখালেন । অপর দিকে মিশনকে সন্তুষ্ট রাখার ও চেষ্টা করতেন [২]। আফগানিস্তানে তখন চলছিল উভয় সংকট । একদিকে বৃটেন এবং রাশিয়ার চেষ্টা ছিল আফগানদেরকে নিরপেক্ষ রাখা অন্যদিকে তাদের শত্রুদের চেষ্টা ছিল আফগানদেরকে বৃটেনের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা[৩]।

জার্মান মিশনের প্রতিনিধি ও ভারতীয় প্রতিনিধিগণ বৃটিশ ভারতে আক্রমণ বিষয়ে দৃঢ় আশাবাদী থাকলেও শেষ পর্যন্ত আফগান সরকারকে যুদ্ধে জড়াতে ব্যর্থ হলে মাওলানা সিন্ধী মুহাজির ছাত্রদেরকে নিজের আয়ত্বাধীন নিয়ে আসেন । পূবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব ছাত্র ভারত সীমান্ত দিয়ে বৃটিশের উপর হামলা অথবা তুরস্ক যেয়ে তুর্কী বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করবে উদ্দেশ্যে কাবুল গিয়েছিল । কিন্তু তারা কাবুলে পৌঁছার পর আফগান সরকার তাদেরকে নজরবন্দী করে রেখেছিলেন। মাওলানা সিন্ধী কাবুলে পৌঁছে সর্দার নসরুল্লাহ খানের সাথে সাক্ষাৎ করে এদের মুক্ত করেছিলেন। কাবুলের পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য করে মাওলানা সিন্ধী এদেরকে তুরস্কে যাবার খেয়াল বাদ দিয়ে কাবুলে থেকে কাজ করার পরামর্শ দেন। সিন্ধী এদেরকে নিয়ে আফগানিস্তানে অবস্থান করেই সুযোগমত ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নিলেন । মুজাহিদ ছাত্ররাও তুরস্কে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করেন। এর কিছু দিন পর আরো কিছু নওজোয়ান পেশওয়ার থেকে কাবুলে পৌঁছেন। মাওলানা সিন্ধী তাঁর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এদের সবাইকে নিয়ে এবং ইতিমধ্যে কাবুলে আগত শায়খুল হিন্দের উল্লেখ্যযোগ্য দু'জন সহযোদ্ধা- মাওলানা মনসূর আনসারী ও মাওলানা সাইফুর রহমান[৪] এবং মাওলানা মুহাম্মদ বশীরের পরামর্শক্রমে "জুনূদুল্লাহ" (আল্লাহর বাহিনী) নামে একটি মুক্তিফৌজ বা কর্মী বাহিনী গঠন করেন । পরবর্তী সময়েও যেসব নওজোয়ান ভারত থেকে

---

১. তাহির, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১

২. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৭২-১৭৩।

৩. নূর-উদ-দীন আহমদ, (অনূ) প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

৪. **মাওলানা সাইফুর রহমানঃ** মাওলানা সাইফুর রহমানের পরিবারের লোকেরা ছিলেন কান্দাহারের অধিবাসী । তবে তিনি পেশওয়ারে বসতি স্থাপন করেন। তিনি মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। দিল্লীর ফতেহপুরী মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন । শায়খুল হিন্দের উৎসাহে বিপ্লবী দলে যোগ দেন এবং তাঁরই পরামর্শে সীমান্ত এলাকায় হিজরত করেন। সীমান্তের লৌহমানব হাজী তুরঙ্গজায়ী এবং সীমান্তের মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে ইংরেজ ছাউনী ও সৈন্যস্থাপনায় হামলা করতেন । কাবুলে আমীর হাবীবুল্লাহ খানের শাসনামলে বন্দি হন, কিন্তু পরবর্তীতে আমীর আমান উল্লাহ খানের শাসনামলে মুক্ত হয়ে দূত ও মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। ("দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৮।)

Dhaka University Institutional Repository

কাবুলে উপনীত হন তারাও ঐ বাহিনীতে যোগদান করেন। এভাবে দলের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে [১]।

মাওলানা সিন্ধীর গঠিত জুনূদুল্লাহ বা মুজিফৌজের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের বিবরণঃ

ক. পেট্রোনঃ

১. চীফ জেনারেল খলীফাতুল মুসলিমীন ২. সুলতান আহমদ শাহ্ কাচার, ইরান ৩. আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান, কাবুল।

খ. ফিল্ড মার্শালঃ

১. আনওয়ার পাশা ২. দৌলতে উসমানিয়ার যুবরাজ ৩. দৌলতে উসমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী ৪. আব্বাস হিলমী পাশা ৫. শরীফ, মক্কা মুকার্‌রামা ৬. নায়িবুস্‌সুলতানাত সর্দার নসরুল্লাহ খান, কাবুল ৭. মুঈনুস্ সুলতানাত সর্দার ইনায়াত উল্লাহ খান, কাবুল ৮. নিযাম, হায়দারাবাদ ৯. ওয়ালী, ভূপাল ১০. নবাব, রামপুর ১১. নিযাম, ভাওয়ালপুর ১২. রঈসুল মুজাহিদীন (মৌলবী আব্দুল করীম) ।

গ. জেনারেল ঃ

১. সুলতানুল মুআয্যম মাওলানা মাহমূদ হাসান মুহাদ্দিস দেওবন্দী ২. কাবুল জেনারেলের স্থলাভিষিক্ত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী।

ঘ. লেফটেন্যান্ট জেনারেলঃ

১. মাওলানা মুহ্‌য়িউদ্দিন খান ২. মাওলানা 'আব্দুর রহীম ৩. মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ, ভাওয়ালপুর ৪. মাওলানা তাজ মুহাম্মদ সিন্ধী ৫. মৌলবী হুসাইন আহমদ মাদানী ৬. মৌলবী হামদুল্লাহ হাজী সাহেব, তূরঙ্গযায়ী ৭ ডাঃ মুখতার আহমদ আনসারী ৮. হাকীম আব্দুর রায্‌যাক ৯. মুল্লা সাহেব বাবরা ১০. কুহিস্তানী ১১. জান সাহেব বাজুরা ১২. মৌলবী ইব্রাহীম ১৩.মৌলবী মুহাম্মদ মিঁয়া ১৪. হাজী সাঈদ আহমদ ১৫. শায়খ 'আব্দুল 'আযীয সদেশ ১৬. মৌলবী 'আব্দুল করীম রঈসুল মুজাহিদীন ১৭. মৌলবী আব্দুল আযীয রহীমাবাদী ১৮. মৌলবী 'আব্দুর রহীম আযীমাবাদী ১৯. মৌলবী আব্দুল্লাহ গাযীপুরী ২০. নবাব যমীরুদ্দীন আহমদ ২১. মৌলবী 'আব্দুল বারী ২২. আবুল কালাম ২৩. মুহাম্মদ আলী ২৪. শওকত আলী ২৫ যাফর আলী ২৬ হাসরত মোহানী ২৭. মৌলবী 'আব্দুল কাদির কাসূরী ২৮. মৌলবী বরকতুল্লাহ ভূপালী ২৯. পীর আসাদুল্লাহ শাহ সিন্ধী।

ঙ. মেজর জেনারেলঃ

১. মৌলবী সায়ফুর রহমান ২.মৌলবী মুহাম্মদ হাসান মুরাদাবাদী ৩. মৌলবী আব্দুল্লাহ আনসারী

---

১. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মীর সিরাজুদ্দীন বাহাওয়ালপুরী ৫. মুল্লা আব্দুল খালিক ৬. মৌলবী বশীর, রঈসুল মুজাহিদীন ৭. শায়খ ইব্রাহীম সিন্ধী ৮. মৌলবী মুহাম্মদ আলী কাসূরী ৯. সায়্যিদ সুলায়মান নদবী ১০. ইমাদী গোলাম হুসাইন আযাদ সুবহানী ১১. কাযিম বে ১২. খুশী মুহাম্মদ ১৩. মৌলবী 'আব্দুল বারী, অস্থায়ী ভারত সরকারের মুহাজির ওকীল।

চ. কর্ণেলঃ

১. শায়খ 'আব্দুল কাদির মুহাজির ২. শুজাউল্লাহ মুহাজির, অস্থায়ী ভারত সরকারের নায়িবে ওকীল ৩. মৌলবী 'আব্দুল 'আযীয, ইয়াগীস্তানের হিযবুল্লাহ-এর দূতের ওকীল ৪. মৌলবী ফযলে রব্বী ৫. মিয়াঁ ফযলুল্লাহ ৬. সদরুদ্দীন ৭. মৌলবী 'আব্দুল্লাহ সিন্ধী ৮. মৌলবী আবূ মুহাম্মদ আহমদ লাহোরী ৯ মৌলবী আহমদ আলী, সহকারী সম্পাদক, নাযারাতুল মা'আরিফ ১০. শায়খ 'আব্দুর রহীম সিন্ধী ১১. মৌলবী মুহাম্মদ সাদিক সিন্ধী ১২. মৌলবী ওলী মুহাম্মদ ১৩. মৌলবী উযায়রগুল ১৪. খাজা 'আব্দুল হাই ১৫. কাযী যিয়াউদ্দীন (এম.এ) ১৬. মৌলবী ইব্রাহীম শিয়ালকোটী ১৭. 'আব্দুর রশীদ (বি. এ) ১৮. মৌলবী যহূর মুহাম্মদ ১৯. মৌলবী মুহাম্মদ মুবীন ২০. মৌলবী মুহাম্মদ ইউসূফ গাঙ্গুহী ২১. মৌলবী রশীদ আহমদ আনসারী ২২. মৌলবী সায়্যিদ আব্দুস সালাম ফারূকী ২৩. হাজী আহমদ জান সাহরানপুরী।

ছ. লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ঃ

১. ফযল মাহমূদ ২. মুহাম্মদ হাসান (বি. এ) মুহাজির ৩. শায়খ 'আব্দুল্লাহ (বি. এ) মুহাজির ৪. যাফর হাসান (বি.এ) মুহাজির ৫. আল্লাহ নেওয়ায খান (বি.এ) মুহাজির ৬. রহমত আলী (বি.এ) মুহাজির ৭. 'আব্দুল হামীদ (বি.এ) মুহাজির ৮. হাজী শাহ্‌বখ্‌শ সিন্ধী ৯. মৌলবী 'আব্দুল কাদির দীনপুরী ১০. মৌলবী গোলাম নবী ১১. মুহাম্মদ আলী সিন্ধী ১২. হাবীবুল্লাহ।

জ. মেজরঃ

১. শাহ নেওয়ায ২. 'আব্দুর রহমান ৩. 'আব্দুল হক।

ঝ. ক্যাপ্টেনঃ

১. মুহাম্মদ সলীম ২. করীম বখশ।

ঞ. ল্যাফটেনেন্টঃ

১.নাদির শাহ্ [১]।

এদলটি আমীর আমান উল্লাহ খানের শাসনামলে তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এবং আফগানিস্তানের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনে[২]।

---

১. মুজতবা হুসাইন, এ, এইচ, এম, ডঃ, "শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমূদ হাসান (র.)ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর কূটনৈতিক তৎপরতা" ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা, (অক্টোবর - ডিসেম্বর ১৯৯৯।) পৃ: ২৪-২৫।

২. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৮-২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সিন্ধী কাবুলে অবস্থান করে সাংগঠনিক দক্ষতা ও কূটনৈতিক তৎপরতা দ্বারা বৃটিশ ভারতে আক্রমণ বিষয়ে আফগান সরকারের নৈতিক সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হন । সিন্ধী নিজে ও রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের পরামর্শক্রমে কাবুলস্থ নতুন অস্থায়ী ভারত সরকার সর্বপ্রথম আমীর নসরুল্লাহ খানের অনুমতি নিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে সামনে রেখে বিদেশে তিনটি মিশন প্রেরণ করেন । প্রথম মিশনটি পাঠানো হয় রাশিয়া। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে রুশ আক্রমণের আশংকা রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই রাশিয়া আফগানিস্তানে হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে বলে আফগান সরকার আশংকা প্রকাশ করছিলেন ! বিষয়টি তদন্তের জন্য অস্থায়ী ভারত সরকারের পক্ষ থেকে রুশ সরকারের নিকট মিশনটি পাঠানো হয়[১]। এ দলের প্রতিনিধি হিসেবে খুশী মুহাম্মদ ওরফে মির্যা মুহাম্মদ আলী এবং ডঃ মথুরা সিং অর্ন্তভুক্ত ছিলেন[২]। উল্লেখ্য, দেশত্যাগী কলেজ ছাত্ররা দেশত্যাগের সময় সীমান্ত এলাকায় পৌছার আগেই কৌশল হিসেবে প্রত্যেকে একটি ছদ্মনাম ধারণ করেন । তখন খুশী মুহাম্মদ ছদ্মনাম রেখেছিলেন মির্যা মুহাম্মদ আলী। এ মিশন ১৯১৬ খৃঃ মার্চে রাশিয়া যাবার উদ্দেশ্যে তাসকন্দ রওয়ানা হয়। অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ মিশনকে একটি স্বর্ণের সিংহাসন প্রদান করেন। সিংহাসনে রুশ জার শাসনামলের প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন খোদাই ছিল। এছাড়া তাসকন্দের গভর্ণর ও রাশিয়ার জার সরকারের নামে দু'টি চিঠি লিখা হয়েছিল। চিঠিদ্বয় মাওলানা বরকত উল্লাহ ও রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ লিখে ছিলেন । রুশ সরকার ঐ মিশনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। মিশন রাশিয়ার জার সরকারকে ভারতবর্ষের অবস্থা সর্ম্পকে অবহিত করেন। কিন্তু রাশিয়ার জার সরকার তখন নিজেই বিপন্ন । তাই মিশনকে সামনে রেখে রুশ সরকার বৃটিশকে চাপ দিতে থাকল। কিন্তুবৃটিশ সরকার আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে হামলা হবার আশংকা আছে, এ ভয় দেখিয়ে রাশিয়ার জার সরকারকে উল্টো ভীত করে তুলে এবং রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করে । এতে জার সরকার ভীত হয়ে মিশনকে গ্রেফতার করার হুকুম দিল এবং ইংরেজ সরকারের নিকট থেকে বিশেষ স্বার্থ উদ্ধার নিমিত্ত মিশনকে ইংরেজদের হাতে সোর্পদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ সরকার বিষয়টিকে জারের দুষ্টবুদ্ধির আবিষ্কার বলে ধরে নিল[৩]। অবশ্য তাসখন্দ সরকারের হস্তক্ষেপে ঐ মিশন রক্ষা পায়। চার মাস পর মিশনটি নিরাপদে কাবুল ফিরে আসতে সক্ষম হয়। ঐ প্রতিনিধি দল রাশিয়ায় গমনের ফলে আফগান সরকারের আশংকা অনেকটা প্রশমিত হয়। ঐ মিশন তাদের উদ্দেশ্য পূরণে যদিও পুরোপুরি সফল হতে পারেনি, কিন্তু কিছুটা হলেও সফল হয়। মিশন রাশিয়ায় যাবার পর বৃটিশ ও রাশিয়ার মধ্যকার ঐক্যে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটিয়েছে । সে ঐক্যের ফাটল নিরসনের জন্য মাওলানা সিন্ধীর বর্ণনামতে

---

১. তাহির, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১-১২।

২. "নকশ- এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৬২-১৬৩।

৩. তাহির, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশের একটি উচ্চপদস্ত প্রতিনিধি দলকে রাশিয়ায় পাঠাতে হয়েছিল[১]।

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও মাওলানা সিন্ধী পরামর্শক্রমে আরো দু'টি মিশন জাপান এবং ইস্তাম্বুলের জন্য প্রস্তুত করেন। ইস্তাম্বুলের মিশনে মাওলানা সিন্ধীর সহকর্মী আব্দুল বারী বি.এ. ও শুজাউল্লাহ অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। এদের ইরান হয়ে ইস্তাম্বুল যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর জাপানের মিশনে জনাব আব্দুল কাদির বি.এ, এবং ডঃ মথুরা সিং অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। এ মিশনটি অধ্যাপক বরকত উল্লাহর প্রস্তাব অনুযায়ী রাশিয়া হয়ে জাপানে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়[২]। মাওলানা সিন্ধী মুজাহিদ দলের নেতা মাওলানা বশীর থেকে অর্থ ধার নিয়ে ইস্তাম্বুলগামী মিশনকে একশ' পাউন্ড এবং জাপানগামী মিশনকে একশ' পাউন্ড প্রদান করেন। আমীর নসরুল্লাহ খানের অনুমতি নিয়ে মিশন দু'টি নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু জাপান গমনেচ্ছু প্রতিনিধি দলকে রুশ সরকার তাদের সীমান্তে পৌছা মাত্রই গ্রেফতার করে বৃটিশের হাতে সমর্পণ করে। মিশনকে কিছুদিন নজরবন্দী করে রাখার পর ছেড়ে দেয়[৩]। অপর দিকে ইস্তাম্বুলগামী মিশন ইরানে সরাসরি বৃটিশ সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হয়। ঐ মিশনের প্রতিনিধি ডঃ মথুরা সিং বৃটিশ ভারতে বোমা ফেলার কেসের পলাতক আসামী ছিলেন। এ কেসে তাঁকে ফাঁসির রায় দেয়া হয়েছিল। গ্রেফতারে পর তাঁর ফাঁসি কার্যকর করা হয়। শায়খ আব্দুল কাদির প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত নজরবন্দী ছিলেন[৪]। গ্রেফতারকৃত প্রতিনিধিগণের জবানবন্দির মাধ্যমে তাদের আন্দোলনের কর্মসূচী ও নীলনকশা সর্ম্পকে বৃটিশ সরকার অবগত হয়[৫]। ইতিমধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য মাহমূদ আনসারী, ফতেহ মুহাম্মদ, মুহাম্মদ আলী প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবীনেতা কাবুল ত্যাগ করে ভারতের পথে রওয়ানা হয়েছিলেন, তারাও সীমান্তে ইংরেজ সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে তাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য- প্রমান পাওয়া যায়নি বিধায় তারা খালাস পান। তবে ১৮১৮ খৃঃ ৩নং রেগুলেশন অনুসারে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়[৬]। উল্লেখ্য, আফগান সরকারের বৈদেশিক নীতি ছিল বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত এবং আমীর হাবীবুল্লাহ খান ছিলেন বৃটিশ সরকারের তাবেদার। তাই বৃটিশ সরকার এসব বিষয়ে অবগত হবার পর চুপ থাকেনি বরং আফগান সরকারের নিকট এর প্রতিবাদ জানায়, সাথে সাথে আফগান সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে; ভারতীয় রাজনীতিকদের আফগানিস্তান থেকে বহিস্কার করার জন্য। এ অপরাধে অনেকের চাকুরী চলে যায়। মৌলবী মুহাম্মদ আলী এবং শেখ ইব্রাহীম যথাক্রমে কাবুলের হাবীবিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রফেসর ছিলেন, তারা দু'জন চাকুরীচ্যুত হন এবং শায়খুল হিন্দের আন্দোলনের সাথে শরীক থাকার অপরাধে বৃটিশ সরকার

---

১. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৬-১৫৭।

২-৩. -ঐ- পৃঃ ১৬৮।

৪. যাকর হাসান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩।

৫. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০ ;"নকশ-এ হায়াত', ২য় খন্ড, পৃঃ ১৬৯।

৬. মোদাব্বের, মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক নির্বাসিত হন। পরবর্তীতে তাঁদেরকে দেশে ফেরার অনুমতি দেয়া হয়েছিল [১]।

(ঘ) রেশমী রুমাল আন্দোলন

শায়খুল হিন্দ ১৯১৫ খৃঃ অক্টোবরে হেযায পৌছেন । হেযায ছিল তখন তুর্কী শাসিত। তুর্কীরাই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তখনকার মক্কার গর্ভণর ছিলেন গালিব পাশা । তিনি হেযাযেই বাস করতেন । পুরো হেযাযের কর্তৃত্ব ছিল তাঁর হাতে । মদীনার গর্ভণর ছিলেন তাঁর অধীন। শায়খুল হিন্দ যে উদ্দেশ্যে হেযাযে গিয়েছিলেন তা অর্জনের জন্য চেষ্টা চালাতে থাকেন । তিনি সফর সঙ্গীদের সাথে নিয়ে তুর্কী নেতৃবৃন্দর সাথে সাক্ষাৎ করার পথ আবিস্কার করেন। ভারতীয় বংশোদ্ভব হাফিজ আলীজান পরিবারের নেতৃস্থানীয় পুরুষ হাজী আব্দুল জব্বার– এর মাধ্যমে তিনি মক্কার তুর্কী গর্ভণর গালিব পাশার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। হাফিজ আব্দুল জব্বার মক্কাতে একজন সৎ ব্যবসায়ী, আমানতদার, দ্বীনদার ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিশেষ মর্যাদা ও খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। এমনকি মক্কার প্রশাসনের লোকেরাও তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতেন । যা মক্কার অনেক কম লোকের ভাগ্যে জুটেছে। তুরস্কের স্কুলে পড়ুয়া জনৈক তসবীহ ব্যবসায়ী জোয়ান শায়খুল হিন্দ ও গালিব পাশার মধ্যে দোভাষীর কাজ করেন[২]। গালিব পাশা পূর্বেই বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র বিশেষ করে ভারতবর্ষের ব্যবসায়ীগণের মাধ্যমে শায়খুল হিন্দের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা সর্ম্পকে অবগত ছিলেন । ভারতবর্ষে তাঁর মর্যাদা ও খ্যাতি রয়েছে এবং ইলমী ও আমলী জগতের শিরোমনি হিসেবে তাঁর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলে তিনি জানতে পারেন । গালিব পাশা শায়খুল হিন্দের প্রশংসা করেন এবং তাঁর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করেন। তিনি শায়খুল হিন্দকে সহযোগিতা বিষয়ে পূর্ণ আশ্বাস দেন। গালিব পাশা তাঁকে ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের নিয়ে সম্মিলিত ভাবে আন্দোলন করার পরার্মশ দেন । যে পরামর্শ মাওলানা সিন্ধীকেও কাবুলের আমীর হাবীবুল্লাহ খান দিয়েছিলেন। তবে বিষয়টির গুরুত্ব শায়খুল হিন্দ আগে থেকেই অনুভব করেছিলেন[৩]। গালিব পাশার এ পরামর্শ তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ বহন করে। কারণ উসমানীয় খিলাফতে তুর্কী, ঈসায়ী, ইহুদী, আরমানী ইত্যাদি জাতিকে পৃথক পৃথক জাতি মনে করা হত । এদেরকে সম্মিলিত শক্তি মনে করা হতনা । তাই দেখা গেছে, ইউরোপের নতুন নতুন শক্তিগুলো এদেরকে ব্যবহার করে ফায়দা উঠিয়েছে [৪]।

শায়খুল হিন্দ হেযাযের গভর্ণর গালিব পাশার নিকট থেকে দু'টি পত্র ভারতবাসীর নামে লিখিয়ে নেন। এর একটিতে ছিল শায়খুল হিন্দকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করা ও বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আহবান [৫]। এ পত্রটি আফগানিস্তান, সীমান্তের স্বাধীন এলাকা

---

১. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩০ ।

২-৩. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ২১৩-২১৪।

৪. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৩ ।

৫. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ২১৪;"দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

ও ভারতের অভ্যন্তরে প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখা হয়েছিল । ইতিহাসে একে "গালিবনামা" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উক্ত পত্রে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনে জীবন দিয়ে লড়তে উপদেশ দেয়া হয়। দ্বিতীয় পত্রটি ছিল, আফগান সরকারের নামে। পূর্বে প্রেরিত দূত মারফত সম্পাদিত আফগান-তুর্কী চুক্তির অনুমোদন বিষয়ে। এ চুক্তির মর্ম ছিলঃ " তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারত আক্রমণ করবে। প্রয়োজনে আফগান বিরোধী শক্তির সাথে লড়বে। কিন্তু তারা আফগানিস্তানের কোন অংশে হাত দেবেনা "। ইতিহাসে একে "গালিব চুক্তিনামা" হিসেবে আখ্যয়িত করা হয়েছে[১]। শায়খুল হিন্দ গালিব পাশার নিকট ইস্তাম্বুল গমন ও তুরস্কের যুদ্ধমন্ত্রী আনোয়ার পাশা'র সাথে সাক্ষাৎ এবং তার আগে মদীনায় কিছুদিন অবস্থান করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে, গালিব পাশা মদীনার তুর্কী গর্ভণরের নামে শায়খুল হিন্দের পরিচয় ও গুণাগুণ বর্ণনা করতঃ একটি পত্র লিখে তা শায়খুল হিন্দের নিকট অর্পণ করেন । পত্রে শায়খুল হিন্দের ইস্তাম্বুল যাত্রার বিষয়ে সবধরণের সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থা করার জন্য গর্ভণরকে নির্দেশ দেন । গালিব পাশা শায়খুল হিন্দের পরিচয় ও গুণকীর্তন বর্ণনা করে এবং তাঁকে মুক্তিসংগ্রামে সাহায্য করার জন্য আনোয়ার পাশাকে সুপারিশ করেও একটি পত্র লিখে দেন । শায়খুল হিন্দ কিছুদিন মদীনায় অবস্থান, অতঃপর ইস্তাম্বুল গমন করে আনোর পাশার সাথে সাক্ষাৎ করবেন সিদ্ধান্ত নিয়ে সফরসঙ্গী মৌলবী মুরতাযা হাসান, মাওলানা মুহাম্মদ মিঁয়া, মাওলানা মনসূর আনসারী ও মৌলবী সুহাইলকে ভারতে ফিরে আসার পরামর্শ দেন[২]। তখন গালিব পাশার পত্রটি (গালিবনামা) মাওলানা মনসূর আনসারীর নিকট অর্পণ করেন। মনসূর আনসারী পত্রটি বহন করে ভারতে নিয়ে আসেন । তবে ভারতের অভ্যন্তরে এর প্রচার করা সম্ভব হয়নি;বরং সীমান্ত এলাকায় ও আফগানিস্তানে প্রচার করা হয়। পরবর্তীতে এর কপি সীমান্তের উপজাতীয়দের নিকট থেকে বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে "রাওলাট কমিটি"-এর হস্তগত হয়েছিল [৩]।

শায়খুল হিন্দ মদীনায় গমন করে তাঁরই একান্ত ঘনিষ্ঠ ছাত্র ও শিষ্য শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর সাক্ষাৎ পান। তিনি প্রায় তের বছর যাবত মহানবীর (সা.) মসজিদে নববীতে হাদীসের অধ্যাপনায় রত আছেন। মাওলানা হুসাইন আহমদও শায়খুল হিন্দকে বিপ্লবের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। শায়খুল হিন্দ গালিব পাশার পত্র নিয়ে মদীনার তুর্কী গভর্ণরের নিকট পেশ করে তাঁকে তুরস্কে পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন জানান। মদীনার গর্ভণর বসরীপাশা প্রথম দিকে কতিপয় ভ্রান্ত রির্পোটের ভিত্তিতে শায়খুল হিন্দকে মদীনাতে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং তাঁর কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করেন। কিন্তু শায়খুল ইসলাম মাদানীর প্রচেষ্টায় এসব সমস্যার সমাধান হয় এবং কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

---

১. [১]আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৪-১৮৫।

২-৩. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

মদীনাতে কিছু দিন অবস্থান করার পর শায়খুল হিন্দ যখন ইস্তাম্বুল যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন; তখন মদীনার গভর্ণর তাঁকে জানালেন, এক আকস্মিক সফরে মহানবীর (সা.) রওজা জিয়ারত উদ্দেশ্যে আনোয়ার পাশা মদীনায় আসবেন। তাঁর সাথে তুর্কী সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের সেনাপতি জামাল পাশাও আসবেন। তাই তাঁকে তুরস্কে যেতে হবেনা। শায়খুল হিন্দ আনোয়ার পাশার সাথে সাক্ষাৎ করেন । এ সাক্ষাৎ সম্ভব হয়েছিল শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানীর মাধ্যমে । তুর্কী সরকারের উচ্চ পদস্ত সামরিক নেতৃদ্বয়- আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশার সঙ্গে শায়খুল হিন্দের গোপনীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । সে বৈঠকে আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশার সাথে শায়খুল হিন্দ, মাওলানা খলীল আহমদ ও মাওলানা মাদানী অংশগ্রহণ করেন । সে বৈঠকে শায়খুল ইসলাম মাদানী মুসলিম বিশ্বের সমকালীন পরিস্থিতির আলোকে জিহাদের গুরুত্ব সর্ম্পকে বক্তব্য রাখলে জেনারেলদ্বয় মুগ্ধ হন। ঐ বৈঠকে জেনারেলদ্বয় শায়খুল হিন্দকে ভারতবর্ষে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করবেন বলে জানান । অচিরেই সন্ধিচুক্তি হবে বলে জানান । সে বৈঠকে শায়খুল হিন্দের আবেদনের প্রেক্ষিতে আনোয়ার পাশার দস্তক্ষত সম্বলিত আরবী, ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় আলাদাভাবে তৈরি হয় সামরিক গোপনচুক্তি। ইতিহাসে ঐ চুক্তিনামাকে বলা হয় "আনোয়ারনামা"। আরবী, ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় রচিত তিনটি গোপনচুক্তির মর্ম এক ও অভিন্ন ছিল । পার্থক্য শুধু ভাষাগত। চুক্তিপত্র গুলোতে আনোয়ার পাশার সীলমোহর অংকিত ছিল। পত্র তিনটির একটি লিখা হয়েছিল শায়খুল হিন্দের নামে । দ্বিতীয়টি মুসলিম জাতির প্রতি শায়খুল হিন্দকে সমর্থন ও সহযোগিতা করার আহবান জানিয়ে। তৃতীয়টি ছিল বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধ সর্ম্পকে তুর্কী ও আফগান সরকারের মধ্যে । এ পত্রে তুর্কী সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং ভারতীয়দের বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধে তুর্কী সরকারের পক্ষ থেকে সামরিক সাহায্যের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং শায়খুল হিন্দকে সাহায্য করার জন্য তুর্কী সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের নির্দেশ দেয়া হয়[১]।

আনোয়ার পাশার প্রথম পত্রটি সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, শায়খুল হিন্দ মক্কার বিদ্রোহী গর্ভণর শরীফ হুসাইন কর্তৃক গ্রেফতার হবার আগ মুহূর্তে (১০ জুন, ১৯১৬ খৃঃ) ধ্বংস করে দেন[২]। দ্বিতীয় ও ৩য় পত্রটি মাওলানা হাদী হাসানের মাধ্যমে হেযায থেকে ভারতে পাঠিয়ে দেন[৩]। শায়খুল হিন্দ মক্কায় অবস্থান করেই তুর্কী গোয়েন্দাদের মাধ্যমে জানতে পারেন, তাঁর এবং মাওলানা সিন্ধীর গোপন কূটনৈতিক তৎপরতা সর্ম্পকে বৃটিশ গোয়েন্দারা অবহিত হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজে না এসে বরং চিঠিগুলো পাঠাতে একটি কাঠের বাক্স বানিয়ে ঐ বাক্সের

---

১. [১]আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫-১৮৬।

২. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৩ ; "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ২১৪।

৩. [৩]আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯০-১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

তক্তা চিড়ে তন্মধ্যে পত্রগুলো রেখে তা যুক্ত করে দেন। এতে কেউ সন্দেহ করার কোন সুযোগ পেলনা। অতঃপর বাক্সটিতে বিভিন্ন প্রকার কাপড় ভর্তি করে গোপনে ভারতে পাঠিয়ে দেন। মুজ্জাফর নগর জেলার মাওলানা হাদী হাসান ও সিন্ধু হায়দারাবাদের হাজী শাহ বখশ মারফত বাক্সটি পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, তাঁরা যেন গন্তব্যস্থানে পৌছে উক্ত চুক্তিনামার কপিগুলো বের করে মুজ্জাফর নগর জেলার অধিবাসী হাজী নূর হাসানের নিকট দিয়ে বলেন, তিনি যেন আহমদ মির্জা নামক ফটোগ্রাফার থেকে উক্ত তুর্কী সামরিক চুক্তিনামার কাগজগুলো ফটোকপি করে নির্দেশিত স্থানে বিলি করেন [১]। সিন্ধুকটি নিয়ে জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পৌছা মাত্রই জাহাজে শায়খুল হিন্দ এসেছেন মনে করে বৃটিশ গোয়েন্দারা জাহাজে আছড়ে পড়ে ও শায়খুল হিন্দকে খুঁজতে থাকে । জাহাজে শায়খুল হিন্দের একজন ভক্ত ছিলেন । তিনি মাওলানা হাদী হাসানকে সন্তর্পণে বললেন, " গোপনীয় কিছু নিয়ে এসে থাকলে আমাকে দিয়ে দিন, আমি পার করে দেই" । মাওলানা হাদী হাসান বাক্সটি তার হাতে সমর্পণ করেন। গোয়েন্দা পুলিশ যখন শায়খুল হিন্দকে তল্লাশীতে ব্যস্ত তখন শায়খুল হিন্দের উক্ত ভক্তটি তার অন্যান্য মালের সাথে ঐ সিন্ধুকটি পার্সেল করে গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন[২]। পুলিশ জাহাজে শায়খুল হিন্দকে না পেয়ে জাহাজে আগত মাওলানা খলীল আহমদ ও মাওলানা হাদী হাসানকে তাদের পাহারায় নিয়ে ব্যাপক তল্লাশী করে। তল্লাশী করতে তাদের লাঠিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলে । তাদের উপর শারীরিক নির্যাতন করা হয়। কিন্তু নির্যাতন, লোভ ও প্রলোভন দেখিয়ে কোন ফল না হওয়াতে দেড় মাস পর তাদের ছেড়ে দেয় [৩]।

এ ঘটনার দেড়মাস পর গোয়েন্দা পুলিশ সামারিক চুক্তির কথা জানতে পারে। একদিন মাওলানা হাদী হাসানের ঘরে মাওলানা মুহাম্মদ নবী উক্ত চুক্তিনামাদ্বয় যখন সিন্ধুক থেকে বের করেন, ঠিক সে সময় গোয়েন্দা পুলিশ মাওলানা হাদী হাসানের বাড়ী ঘেড়াও করে। পুলিশের আগমন টের পেয়ে মুহাম্মদ নবী চুক্তিনামাগুলো তৎক্ষণাৎ তাঁর ওয়েস্টকোটের (সদরীয়া) পকেটে ঢুকিয়ে ওয়েস্টকোটটি পুরুষদের কামরায় লটকিয়ে রাখেন। পুলিশ দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত সারা ঘর ও আসবাবপত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে। কত জিনিস নষ্ট করে। কত বাক্স ভাঙ্গে, কিন্তু ওয়েষ্টকোটের উপর তাদের দৃষ্টি পড়েনি। মোট কথা গোয়েন্দা পুলিশ ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল[৪]। এরপর চিঠিগুলো হাজী নূর হাসানের নিকট পৌছায় । তিনি সেগুলো ফটোকপি করার জন্য দিল্লীর ফটোগ্রাফার আহমদ মির্জার নিকট নিয়ে যান । আহমদ মির্জা যখন তাঁর স্টুডিওতে চুক্তিনামাগুলো ফটোকপি করছিলেন, ঠিক তখনই গোয়েন্দা পুলিশ দ্বিতীয়বার তাঁর স্টুডিও ঘেরাও করে। ঘটনাটি বুঝতে পেরে তিনি চুক্তিনামাগুলো মুহূর্তের মধ্যে টেবিলের নীচে রাখা পানির থালায় রেখে দেন । এখানেও গোয়েন্দা পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু থালার দিকে তাদের নজর পড়েনি । পুলিশ এখানেও ব্যর্থ হয়[৫]। বলা হয়, দুটো ঘটনা শায়খুল হিন্দের কারামত ।

১-৩. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ২২২-২২৩।

৪-৫. ঐ, পৃ: ২২৫-২২৬।

Dhaka University Institutional Repository

হাজী নূর হাসান শায়খুল হিন্দের নির্দেশ মতে চুক্তিনামাগুলোর ফটোকপি আন্দোলনের বিভিন্ন কেন্দ্রে পৌছাতে সক্ষম হন। অতঃপর শায়খুল হিন্দের পক্ষ থেকে মুজ্জাফর নগর জেলার রাথেড়ী মৌজার অধিবাসী জনাব নূরুল হাসানকে উক্ত ফটোকপিগুলো যেসব নির্দিষ্ট স্থানে বিলিকরার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, সে দায়িত্ব তিনি সঠিকভাবে পালন করেন[১]।

আনোয়ার পাশার তৃতীয় চুক্তিনামায় এও উল্লেখ্য ছিল, "আফগান সরকারের সমর্থন থাকলে তুরস্ক ১৯১৭ খৃ: ১৯ ফেব্রুয়ারী আফগান সীমান্তের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ভারতে আক্রমণ করবে। সাথে সাথে ভারতের অভ্যন্তরেও বিদ্রোহ ঘটবে। আফগান সরকার ঐ চুক্তি সমর্থন করলে মদীনায় অবস্থানরত মাওলানা মাহমূদ হাসানের মাধ্যমে তুর্কী সরকারকে জানাতে হবে। অনুরূপভাবে শায়খুল হিন্দের মাধ্যমে তুর্কী সরকারের যুদ্ধের নির্দেশটি পুনরায় কাবুলের সদর দপ্তরে পৌছাতে হবে ১৯১৭ খৃ: জানুয়ারীর মধ্যে । কাবুল সদর দপ্তর দিল্লীর সদর দপ্তরে জানাবে ১৯১৭ খৃ: ১ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে। এর পর তুর্কী বাহিনী ৯ ফেব্রুয়ারী আফগান পৌছবে এবং ১৯ ফেব্রুয়ারী বৃটিশ ভারতে আক্রমণ করবে ।

কাবুলস্থ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর নেতৃত্বে আনোয়ার নামা নিয়ে আমীর হাবীবুল্লাহর নিকট যেয়ে তাঁর পক্ষ থেকে উত্তরের অপেক্ষা করতে থাকেন [২]। কিন্তু আমীর হাবীবুল্লাহ বৃটিশ স্বার্থের পরিপন্থি যুদ্ধে জড়াতে রাজী হননি। যদিও আফগান জনগণ ও সরকার বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে প্রস্তুত ছিলেন[৩]। অবশেষে জনসমর্থনের চাপে পড়ে আমীর হাবীবুল্লাহ বিপ্লবী দলের নেতৃবৃন্দের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন ২৪ জানুয়ারী ১৯১৬খৃ: । চুক্তির বিষয় হল, " আফগান সরকার নিরপেক্ষ থাকবে। তুর্কী বাহিনী আফগান সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে। আর আফগান সরকার বৃটিশকে এ কৈফিয়ত দেবে যে, সীমান্তের উপজাতীয়রা সরকারের আওতার বাইরে বিদ্রোহ করেছে"। অস্থায়ী ভারত সরকারের নেতৃবৃন্দ সে চুক্তিকে যথেষ্ট মনে করলেন। কিন্তু আমীর হাবীবুল্লাহ এসব তথ্য সর্ম্পকে বৃটিশ সরকারকে অবহিত করে প্রচুর আর্থিক সুবিধা আদায় করেন। এ পরিস্থিতিতে জার্মান মিশন ১৯১৬ খৃ: মে কাবুল ত্যাগ করেন । এর কিছু দিন পর তুর্কী মিশন কাবুল ত্যাগ করেন[৪]।

এহেন পরিস্থিতিতে কাবুলে অবস্থানরত মাওলানা সিন্ধী ভাবলেন, কাবুলের এসমূহ ঘটনা, মিশনের ব্যর্থতা ও সার্বিক পরিস্থিতি সর্ম্পকে হেযাযে অবস্থানরত শায়খুল হিন্দকে অবগত করাবেন। তাই তিনি শায়খুল হিন্দের নিকট পত্র লিখলেন। তবে বৃটিশ গোয়েন্দাদের নজর এড়াতে পত্রসমূহ কাগজে না লিখে রেশমী রূমালে বুনিত অক্ষরে লিখালেন । যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে "রেশমী রূমালপত্র" বা "রেশমী রূমাল আন্দোলন" নামে

---

১. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৩।

২-৪. [আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৪-১৭৫, ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাত। রেশমী রুমালে তিনটি পত্র লিখা হয়েছিল। মাওলানা সিন্ধী প্রথম পত্রটি শায়খ আব্দুর রহীম সিন্ধীর নামে লিখেছিলেন । ঐ পত্রটি ছয় ইঞ্চি লম্বা ও পাঁচ ইঞ্চি প্রস্থ রেশমী কাপড়ের টুকরোয় লিখা হয়েছিল। ঐ পত্রে শায়খ আব্দুর রহীমকে হুকুম দেয়া হয়েছিল, তিনি যেন অপর পত্রদ্বয় শায়খুল হিন্দের নিকট পৌছে দেন । দ্বিতীয় পত্রটি হযরত শায়খুল হিন্দের নামে লিখেছিলেন । পত্রটি দশ ইঞ্চি লম্বা ও আট ইঞ্চি প্রস্থ রেশমী কাপড়ের টুকরোয় লিখা হয়েছিল । তৃতীয় পত্রটি পনের ইঞ্চি লম্বা এবং দশ ইঞ্চি প্রস্থ কাপড়ের টুকরোয় লিখা হয়েছিল। যা সরাসরি শায়খুল হিন্দের উদ্দেশ্যে লিখা হয়েছিল। মূলতঃ তিনটি পত্রই শায়খুল হিন্দকে কেন্দ্র করে লিখা হয়েছিল, কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে সেগুলো তাঁর নিকট পৌছে দেয়ার জন্য[১]।

১ম পত্র ঃ

শায়খ আব্দুর রহীম সিন্ধীর নামে লিখা প্রথম চিঠির সংক্ষিপ্ত বিষয় ছিলঃ

১. এ চিঠি পবিত্র মদীনায় অবস্থানরত হযরত শায়খুল হিন্দের নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা করবেন।

২. শায়খুল হিন্দকে পত্রের মাধ্যমে এবং মৌখিকভাবেও সর্তক করে দিতে হবে যে, তিনি যেন কাবুলে আসার চেষ্টা না করেন।

৩. শায়খুল হিন্দ এ বিষয়টি সর্ম্পকে যেন অবগত থাকেন যে, মাওলানা মনসূর আনসারী এবার হজ্জে যেতে পারছেন না।

৪. আব্দুর রহীম সিন্ধী যে ভাবেই হোক কাবুলে মাওলানা সিন্ধীর সাথে দেখা করবেন।

৫.শায়খুল হিন্দের জন্য লিখিত চিঠি মদীনায় পৌছাল কিনা সে সর্ম্পকে বিস্তারিত লিখে কাবুলে জানাবেন।

পত্রটি লিখার তারিখ ছিল ৮ রমযান/ ৯ জুলাই ১৯১৬ খৃঃ[২]।

২য় পত্র ঃ

দ্বিতীয় পত্রটি ভারতের স্বাধীনতাকামী মুজাহিদগণের বিষয় নিয়ে লিখা হয়েছিল। এতে মুজাহিদগণকে নিয়ে প্রস্তাবিত "জুনূদুল্লাহ" বা মুক্তিফৌজ গঠনের পূর্ণ বিবরণ ছিল। জুনূদুল্লাহ মুজাহিদগণের ১০৪ জন অফিসারের নাম এবং তাঁদের বেতন-ভাতার কথা উল্লেখ্য ছিল । মুজাহিদ অফিসারগণের দায়িত্ব সর্ম্পকে বলা হয়েছিল যে, তারা মুজাহিদগণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেবেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে কাজে লাগাবেন। এও উল্লেখ্য করা হয় যে,এসব মুজাহিদকে হিন্দুস্তান সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করা হবে । ঐ মুজাহিদ বাহিনীর কেন্দ্র হবে মদীনায়। শায়খুল হিন্দকে ঐ বাহিনীর প্রধান করার কথা ছিল। তিনজন পৃষ্টপোষক, বারজন জেনারেল এবং উচ্চপদস্ত কর্মকর্তার নাম ছিল। সেনাপতিদের অধীন কেন্দ্রসমূহ হবার কথা ছিল

১-২. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০-২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

কনস্টান্টিনোপল, তেহরান এবং কাবুলে । কাবুলের সেনাবাহিনীর প্রধান হবার কথা ছিল মাওলানা সিন্ধীর। পত্রে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের কর্মোদ্দীপনা, জার্মান মিশনের আগমন ও তাদের কর্মতৎপরতা, অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা এবং রুশ, জাপান ও তুরস্কে মিশন প্রেরণের পূর্ণ বিবরণ ছিল। পত্রে শায়খুল হিন্দকে অনুরোধ করা হয়েছিল, তিনি যেন এসব বিষয়ের তথ্য তুরস্কের উসমানীয় খলীফার নিকট পৌছে দেন[১]।

৩য় পত্র ঃ

তৃতীয় পত্রটির ক্ষেত্রে বলা হয় যে, এটি লিখা হয়েছিল মাওলানা মনসূর আনসারী পক্ষ থেকে। এ চিঠিতে তিনি হজ্জ সম্পাদনা শেষে হেযায থেকে ভারতে ফিরে এসে পরবর্তী আন্দোলনের যাবতীয় ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ্য করেছিলেন । মনসূর আনসারী তাঁর চিঠিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের হাল-অবস্থা এবং কোন কোন নেতা-কর্মী বৃটিশ সরকারের নির্যাতনের ভয়ে নিরুৎসাহী ও নিস্ক্রিয় রয়েছেন, তা উল্লেখ করেন। চিঠিতে তিনি এও উল্লেখ করেন যে, "আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও আমার পক্ষে এবার হেযাযে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি হেযায থেকে যে "গালিবনামা" বহন করে এনেছিলেন তা বন্ধুদেরকে দেখানো হয়েছে এবং উপজাতীয় এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে। মুজাহিদগণকে গালিবনামা দেখানোতে তাদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা এখন যুদ্ধ করছে। সীমান্তের লৌহমানব হাজী তুরঙ্গযায়ী এখন "মেহমন্দ" এলাকায় অবস্থান করছেন। পত্রে তুর্কী -জার্মান মিশনের আগমন এবং তাদের ব্যর্থতার কারণও উল্লেখ করা হয়[২]।

পত্রগুলো রেশমী রুমালে খোদিত করে লিখানোর পর মাওলানা সিন্ধী সে গুলো মদীনায় শায়খুল হিন্দের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করেন । একাজের জন্য তিনি শায়খ আব্দুল হক নামক একজন নওমুসলিমকে বাহক হিসেবে নিয়োগ করেন। শায়খ আব্দুল হক ছিলেন একজন নওমুসলিম। বেনারসের এক হিন্দু পরিবারের সন্তান । ইংরেজীতে এম. এ. পাশ। শায়খুল হিন্দের সাগরিদ ও কর্মী । তিনি মুহাজির ছাত্রদের সাথে কাবুল সীমান্ত, পাঞ্জাব ও ভাওয়ালপুর হয়ে মুলতান পৌছেন । আব্দুল হক আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে কাপড়ের ব্যবসা করতেন । তাঁর কাবুল গমনের উদ্দেশ্য ছিল, কাপড়ের ব্যবসা এবং তার দীর্ঘ দিনের পুরানো বন্ধু বৃটিশ অনুগতচর "রব নেওয়াজ"-এর দুই ছেলের খবরাখবর জানা । ঐ দুই ছেলেও মুহাজির ছাত্রদের দলভুক্ত হয়ে আফগানিস্তান পৌছে ছিলেন এবং জুনুদুল্লাহ'র সদস্য হয়ে কাজ করছিলেন। আব্দুল হকের ব্যবসার কাপড়ের মধ্যে রেশমী রুমালটি লুকিয়ে রাখা হয়। আব্দুল হকের প্রতি সিন্ধীর নির্দেশ ছিল, তিনি সিন্ধুর শায়খ আব্দুর রহীমের নিকট রেশমী

---

১. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩০-২৩১।

২. ঐ, পৃ: ২৩০-২৩১ ; আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১০-১১১।

Dhaka University Institutional Repository

রূমালপত্রটি পৌঁছে দেবেন এবং আব্দুর রহীমকে বলে দেবেন, তিনি যেন হজ্জ্ব করতে যেয়ে শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসানের নিকট পত্রটি পৌঁছে দেন অথবা তিনি নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে শায়খুল হিন্দের নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা করেন। আব্দুল হক মাওলানা সিন্ধীর রূমালটি কাবুল থেকে পেশওয়ার পর্যন্ত বহন করে আনেন । এখানে বৃটিশ গোয়েন্দাদের কড়াকড়ি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তল্লাশি দেখে তিনি তা আর বহন করার সাহস করেননি; বরং ভাওয়ালপুরের বিখ্যাত পীর মৌলবী গোলাম মুহাম্মদ-এর নিকট পত্রগচ্ছিত কোটটি আমানত হিসেবে রেখে আসেন; সিন্ধুতে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য । আব্দুল হক রব নেওয়াযের ব্যক্তিত্ব সর্ম্পকে অসম্ভব ভীত ছিলেন । তাই ভারতে ফিরে এসে তিনি রব নেওয়াযের দেশত্যাগী দুই ছেলের শুভাশুভ সংবাদ জানালেন, সাথে সাথে রব নেওয়াযের ধমকানীতে কাবুলে স্বদেশত্যাগীদের কর্মতৎপরতা, আন্দোলন, সীমান্ত এলাকায় হামলা, রাজা মন্দ্রেহ প্রতাপ ভারতীয় রাজন্যবর্গের নিকট জার্মান সম্রাটের আশ্বাসবাণী সম্বলিত যে চিঠি লিখেছেন এবং রাজন্যবর্গকে যে এও লিখেছেন, সীমান্তের মুজাহিদগণ যখন সীমান্ত অতিক্রম করে বৃটিশের উপর আক্রমণ করবে; তখন তারাও যেন বিদ্রোহ করে, এজন্য মহারাজা ন্যায়পাল ও মহারাজা বড়দাকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে[১]; এসব তথ্য এবং কাবুলে মাওলানা সিন্ধীর কর্মতৎপরতা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম সর্ম্পকেও বিস্তারিত বলে দিলেন। আব্দুল হক তখন রব নেওয়াযের ধমকানীতে ভীত হয়ে সিন্ধীর দেয়া রেশমী কাপড়ের চিঠিগুলো যে কোটের আস্তরে সেলাই করা ছিল, সে কোটটি ভাওয়ালপুরের মৌলবী গোলাম মুহাম্মদের নিকট থেকে নিয়ে এসে রব নেওয়াযের হাতে উঠিয়ে দেন[২]।

রব নেওয়ায ছিলেন ইংরেজদের কেনা গোলাম । তার ভেতর দু'ছেলের দেশ ত্যাগের কারণে ক্ষোভ ও প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করছিল। তাই ঐ চিঠি ও কোট হাতে আসলে বৃটিশ সরকারের অধিক কৃপাদৃষ্টির আশায় সংগে সংগে বৃটিশ গোয়েন্দা প্রধান স্যার মাইকেল এডওয়ার্ড-এর হাতে উঠিয়ে দিয়ে চিঠির যাবতীয় বিষয়ে অবগত করাল[৩]।

বৃটিশের পক্ষে রব নেওয়াযের এ দালালীর কারণে বৃটিশ ভারত সরকার তাকে "খান বাহাদুর " খেতাবে ভূষিত করে। রব নেওয়াযের এই লজ্জাজনক ভূমিকা দেশের মাটির সাথে স্পষ্ট গাদ্দারী । ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস তাকে কোন দিন ক্ষমা করবেনা । সে মীরজাফর আলী খান ও মীর সাদেকের দলভুক্ত হয়ে থাকবে । এ চিঠি সে বৃটিশের হস্তগত না করালে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস আজ অন্যভাবে লিখা হত[৪]। রেশমী পত্রটি লিখা হয়েছিল ১৯১৬ খৃঃ ৯ জুলাই আর তা বৃটিশের হাতে আসে ১৯১৬ খৃঃ ১০ আগষ্ট । পত্রটি

১-২. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩২, ২৩০-২৩৩।

৩. আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩-১৯৫।

৪. ঐ, পৃঃ ২৩০-২৩৪ ; নকশ-এ হায়াত, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

হাতে পেয়ে বৃটিশ সরকার তাদের সরকার বিরোধী আন্দোলনের এই নতুন কূটনৈতিক তৎপরতা সর্ম্পকে অবগত হয় । রব নেওয়াযের গাদ্দারী, আব্দুল হকের স্বীকারোক্তি এবং রেশমী রুমালের বিষয়বস্তু ও বিপ্লবী দলের সমস্ত গোপনীয় তথ্য সর্ম্পকে অবগত হওয়ার রিপোর্ট কমিশনের কাছে পৌঁছা ; কোন অবস্থাতেই কেয়ামতের ভয়াবহতার চেয়ে কম বিভীষিকাপূর্ণ ছিল না; বরং তার চেয়েও বেশী । এ রিপোর্টের ভিত্তিতে বৃটিশ ভারত অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। প্রতি রাতে হাজার হাজার নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করে[১]। সারা ভারতজুড়ে চলে পাকড়াও অভিযান। ঘরে ঘরে তল্লাশী হয় । বিশেষ করে ভারতের আটটি প্রদেশে এ অভিযান চলে ভয়ংকরভাবে । উত্তর প্রদেশ, দিল্লী, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, গুজরাট , বিহার ও বাংলা প্রদেশের অবস্থা ছিল নরককুন্ড। উল্লেখযোগ্য শহর আলীগড়, দেওরিয়া, মিরাট, সুরাট, কলিকাতা, গয়া, রেংগুন (বার্মা), কুটিহার , মুজাফ্ফর নগর, দিল্লী, লখনৌ, বিজনৌর, আজমীর, সিমলা, কসূর, বোম্বাই, সাহারনপুর, দেওবন্দ, রায়পুর, শিয়ালকোট, মুরাদাবাদ, পেশওয়ার, ভাগলপুর, লাহোর, হায়দারাবাদ, ভূপাল ও গাঙ্গুহ শহরের প্রতিটি ঘরে ঘরে পুলিশী তল্লাশী ও ধর-পাকড় হয়[২] । পুলিশ অসংখ্য স্থানে রেড দিয়েছিল । ২৩০ জনের বিরুদ্ধে ইনকুয়ারী ও জিজ্ঞাসাবাদ হয়। এদের মধ্যে ৫৯ জনের বিরুদ্ধে বৃটিশ শাসন উৎখাত ও সে উদ্দেশ্যে বিদেশী সাহায্য প্রার্থনার অভিযোগে মুকদ্দমা দায়ের করা হয় । গ্রেফতারকৃতদের এ পরিসংখ্যান দ্বারা বুঝা যায়, ঐ সব এলাকায় স্বাধীনতা আন্দোলন তখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল [৩]। বিপ্লবীগণ গ্রেফতার ও নজরবন্দী হলে আন্দোলনে ভাটা পড়ে ।

হেযাযে ইতিমধ্যে মক্কার শরীফ হুসাইন বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন (১০ জুন ১৯১৬খৃঃ)। উসমানীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে আরবদের এই বিদ্রোহ এবং শরীফ হুসাইনের ষড়যন্ত্র পুরো পরিস্থিতি পাল্টে দেয় । শরীফ হুসাইনের বিদ্রোহ ঘোষণা ও ক্ষমতা গ্রহণের পর গালিব পাশা, শায়খুল হিন্দ ও শায়খুল ইসলামকে তায়েফে অবরুদ্ধ করে । প্রায় দেড় মাস অবরুদ্ধ থাকার পর তাঁরা মক্কা শরীফে ফেরার সুযোগ পান। তুরস্ক সরকার মুসলমানদের খলীফা হতে পারে না, খিলাফতের অধিকার তাদের নেই, তুরস্কের মুসলমানরা কাফের, শরীফ হুসাইনের বিদ্রোহ ন্যায় সংগত ; এই মর্মে মক্কার কতিপয় আলিম দ্বারা লিখিত একটি ফাতাওয়া শরীফ হুসাইন শায়খুল হিন্দের নিকট দস্তখতের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু শায়খুল হিন্দ উক্ত ফাতাওয়ায় দস্তখত করতে অস্বীকৃতি জানালে, শরীফ হুসাইন জিদ্দায় গমন করে শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান, শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী, হাকিম নুছরত হুসাইন,মাওলানা উযায়রগুল ও মাওলানা আহমদ শহীদকে গ্রেফতার করে বৃটিশের হাতে উঠিয়ে

১-৩. ঐ, পৃ: ২৩০-২৩৪ ; "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

দেয় (ডিসেম্বর ১৯১৬ খৃঃ) । প্রায় এক মাস হেযাযে থাকার পর তাঁদেরকে মাল্টা'য়[১] পাঠিয়ে দেয়[২]। শায়খুল হিন্দ মাল্টায় নীত হলেন। সঙ্গে তাঁর চার জন সঙ্গীও । মাল্টা ছিল তখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের হেডকোয়ার্টার । জার্মান প্রিন্স থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন এলাকার বৃটিশ প্রতিপক্ষের বড় বড় নেতৃবৃন্দকে বৃটিশরা তখন মাল্টায় বন্দী করে রেখেছিল। শায়খুল হিন্দ মাল্টায় বিশ্বনেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনার সুযোগ লাভ করেন এবং তাঁদের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তারা তাঁকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য পরামর্শ দেন [৩]।

অপর দিকে আমীর হাবীবুল্লাহ খানের উপর বৃটিশের চাপের মাত্রা বেরে যায়। ফলে তার সিদ্ধান্তে পরিবর্তন হয় । তিনি কাবুলে মাওলানা সিন্ধীকে নজরবন্দী করে (১৯১৭খৃঃ জুন) একটি সংকীর্ণ ঘরে আটক রাখেন । সংগে বিপ্লবী দলের অন্যান্য নেতাদেরকেও আটক করে। এ সর্ম্পকে মাওলানা সিন্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন, "ভারতে যখন গ্রেফতারী আরম্ভ হল, তখন আমরা বিচলিত হলাম। এর কয়েকদিন পরই শায়খুল হিন্দকে মক্কায় গ্রেফতার করা হয়। কিছু দিনের মধ্যেই এর রহস্য বুঝতে পারি। আমাদের ২০/২৫ জনকে একটি সংকীর্ণ ঘরে নজরবন্দী করে রাখা হয়"[৪]। নজরবন্দী সময়েও সিন্ধী আন্দোলনের কাজকর্ম থেকে নিস্কৃয় থাকেননি; বরং নিজের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা চালিয়ে যান । পরবর্তীতে সিন্ধীকে জালালাবাদে স্থানান্তর করা হয় [৫]।

আমীর হাবীবুল্লাহ খান বৃটিশ সমর্থক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ভাই নসরুল্লাহ খান, সরকারী কর্মকর্তা ও জনগণ ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বের স্বপক্ষে । আমীর হাবীবুল্লাহ ১৯২০ খৃঃ ২০ ফেব্রুয়ারী জালালাবাদের নিকট লাগমান জেলার "গেসে" নামক কিল্লায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে তাঁর ভাই নসরুল্লাহ খান জালালাবাদে নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা দেন । কিন্তু নিহত হাবীবুল্লাহ খানের পুত্র আমান উল্লাহ খান সেনাবাহিনীর সহায়তায় নসরুল্লাহ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্টিত হন । নসরুল্লাহ জেলে মারা যান। আমান উল্লাহ খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর

---

১. **মাল্টাঃ** মাল্টা ইউরোপের অর্ন্তভুক্ত একটি দ্বীপ। প্রথমে সেটি পর্বতপ্রাচীর বেষ্টিত একটি বিশাল কিল্লা ছিল। উক্ত কিল্লায় যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জামাদী, অস্ত্র-শস্ত্র এবং সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখা হত। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিপদজনক বন্দিদেরকে সেখানে আটক রাখা হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে সেটি বিশ্বযুদ্ধ বন্দীখানা রূপে ব্যবহৃত হয়। সেখানে এমনসব যুদ্ধবন্দী ও রাজনৈতিক নেতাদের আটক রাখা হত, যাদেরকে ভয়-ভীতি, প্রলোভন দিয়েও বশে আনতে পারতনা। তৎকালীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে ভয়ানক আতংক সৃষ্টিকারী বন্দীখানা। ("সফর নামা-এ আসীরে মাল্টা", পৃঃ ৮৪-৮৫।)

২-৩. তাহির, মুহাম্মদ, পৃঃ ২১, ২৩; "আসীরানে মাল্টা" পৃঃ ৪৩-৪৬।

৪. আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১২। "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৭১।

৫. "দৈনিক জমী'অত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধীকে কারামুক্ত করেন [১]। আমান উল্লাহ অন্যান্য স্বাধীনতাকামীদের উপরও শিথিলতা প্রদর্শন করেন, সিদ্ধী ও তাঁর সহযোগীদের সাহায্য করেন। সিদ্ধী এ শিথিলতা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, তার দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য নেয়া সম্ভব হবে । সিদ্ধী অনুমান এক বছর আট মাস কারাবরণ করেন[২]। সিদ্ধী আমান উল্লাহ খানের শাসনামলে প্রায় চার বছর কাবুলে অবস্থান করে অস্থায়ী ভারত সরকারের জন্য যেমনি কাজ করে যাচ্ছিলেন, তেমনি কাবুল সরকাররের হিতসাধনে প্রয়াসী হন। আমান উল্লাহ খানের আমলে তিনি কাবুলে "অলইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি"র একটি শাখা গঠন করেন। বৃটিশ ভারতের বাইরে সেটাই ছিল কংগ্রেসের প্রথম শাখা । মাওলানা সিদ্ধী ছিলেন ঐ শাখার সভাপতি । তিনি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কমিটির সাথে এর সম্পর্ক স্থাপন করেন। ডঃ নূর মুহাম্মদ ছিলেন কাবুলস্থ কমিটির সর্বেসর্বা এবং যুফার হাসান ছিলেন সেক্রেটারী[৩]। আমীর আমান উল্লাহ খান ছিলেন স্বাধীনতা প্রিয়। আফগানিস্তানের উপর বৃটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ তিনি পছন্দ করতেন না । তাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। ফলে বৃটিশ ভারতের সাথে তাঁর যুদ্ধ বাধে (মে -জুন ১৯১৯খৃ:)। ইতিহাসে একে তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ বলা হয়। আমীর আমান উল্লাহ খান যুদ্ধের সূচনা করলে মাওলানা সিদ্ধী তাঁর জুনূদুল্লাহ (বাহিনী) সহ ভারতীয় বিপ্লবীরা আফগান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন । তারা আফগান যোদ্ধাদের সাথে কাঁদে কাঁদ মিলিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সে যুদ্ধে দেশের পূবাঞ্চলে আফগান সরকার কিছু নতি স্বীকার করলেও বিজয় আমান উল্লাহ খানের ভাগ্যেই জোটে। সেনাপতি নাদের খানের নেতৃত্বে আফগান বাহিনী কোহাট পর্যন্ত দখল করে। তৃতীয় ইঙ্গ আফগান যুদ্ধের বিবরণ দিতে আনিস সিদ্দিকী বলেনঃ "বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও পর্যাপ্ত গোলাবারুদের অধিকারী হয়েও স্বল্পসংখ্যক আফগান সৈন্যের কাছে তারা যে পরাজিত হতে পারে, তা ইংরেজ সেনাপতিগণ বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁরা যখন খাইবার পাশের অনতিদূরে অবস্থান করে আফগান বাহিনীর পরাজয় এবং আমানুল্লাহর নতি স্বীকারের সংবাদ শ্রবণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, তখন তাঁদের নিকট পৌছল পরাজয়ের মর্মন্তদ বার্তা। তবু তাঁরা বিশ্বাস করলেন না । বিপুল বিক্রমে পূর্নবার আক্রমণ করার জন্য সে স্থান থেকে সেনাধ্যক্ষগণ নতুন আদেশ জারী করলেন। যুদ্ধরত ইংরেজ সৈনিকগণ প্রাণভয়ে সে আদেশ প্রতিপালন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। কিন্তু পরবর্তী দিবসে বাধ্য হয়ে তারা যখন নব আয়োজনে আবার আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হলো, তখন খোসত থেকে আগত পার্বত্য যুদ্ধে বিশেষভাবে পারদর্শী আফগান বাহিনী তাদের নাস্তানাবুদ করে দিলো। চরমভাবে পরাজিত হয়ে পলায়ন পথে অসংখ্য ইংরেজ সৈনিকের অকাল মৃত্যু হলো। বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার আমানুল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করলো। তারাই প্রথম সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো। সন্ধির ব্যাপারে

---

১. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৭১-১৭২।

২. ঐ, পৃ: ১৭৪-১৭৫।

৩. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০৭।

Dhaka University Institutional Repository

আমানুল্লাহ্ নাদির খানের পরামর্শ গ্রহণ করলেন"[১]। যুদ্ধে ভারতীয় বিপ্লবীরা কিছু জনপদ ও ইংরেজ সৈন্য ছাউনী দখল করেন এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার গঠন করেন। তবে এ স্বাধীনতা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯১৯খৃঃ ৮ আগষ্ট রাওয়ালপিন্ডিতে বৃটিশ ভারত সরকার ও আমীর আমান উল্লাহ্ খানের মধ্যে যুদ্ধবন্ধের চুক্তিনামার শর্তের ভিত্তিতে তাদেরকে দখলকৃত এলাকাগুলো ছেড়ে দিতে হয়। ঐ চুক্তিতে বৃটিশ ভারত সরকার আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন[২]।

তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে মাওলানা সিন্ধী ও তাঁর জুনূদুল্লাহ'র অংশগ্রহণ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য আফগান সরকার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। ঐ যুদ্ধে সিন্ধীর ভূমিকা বিষয়ে তৎকালীন আফগানিস্তানের বৃটিশদূত লর্ড হামফ্রে বলেছিলেন ," এ বিজয় আফগানিস্তানের নয় এ বিজয় উবায়দুল্লাহর [৩]। তৃতীয় আফগান যুদ্ধে স্বাধীনতার পর থেকে আমীর আমান উল্লাহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাওলানা সিন্ধীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন । মন্ত্রীদের ন্যায় তাঁর উপর আস্থা রাখতেন । মাওলানা সিন্ধীও আফগান সরকারের মঙ্গল সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন । তিনি একে নিজের সরকার বলে মনে করতেন। নিজের দেশের মত ভালবাসতেন। আর্ন্তজাতিক চাপ না থাকলে কাবুলে থেকেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যেতেন। সিন্ধীর ভাষায়, "যদি নওজোয়ান বন্ধুদের ভবিষ্যৎ আমার সামনে না থাকত, অস্থায়ী সরকারের কোন কোন কাজে অনিচ্ছাকৃত পরাজয় না হত; তা হলে আমি আমীর আমান উল্লাহ্ খানের দেশ ছেড়ে যেতাম না[৪]।

"রেশমী রুমাল আন্দোলন" কথাটি দ্বারা সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কেন্দ্র সমূহের সাথে যোগাযোগ ও সংবাদ আদান প্রদানের কাজ রেশমী রুমালের মাধ্যমে করা হত । মুজাহিদগণ চিত্র শিল্পীর মাধ্যমে রেশমী রুমালে নিজের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য চিত্রায়ন করে অপর কেন্দ্র বা অপর মুজাহিদের নিকট পাঠাতেন। কিন্তু ইতিহাস গবেষকগণের অনেকের মতে বিষয়টি এমন নয়; বরং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমূহ আন্দোলন, কর্মসূচীর মধ্যে রেশমী কাপড় একবারই ব্যবহৃত হয়েছে । যা মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর মাধ্যমে হয়েছে । সিন্ধী কাবুলে অবস্থানকালে মুজাহিদ আন্দোলনের কার্যক্রম ও তাঁদের কূটনৈতিক তৎপরতা সর্ম্পকে মক্কায় অবস্থানরত শায়খুল হিন্দকে অবগত করাতে রেশমী কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করেছিলেন। যাকে ইতিহাসে "রেশমী রুমাল আন্দোলন" নামে

---

১. আনিস সিদ্দিকী, "হতভাগ্য বাদশা আমানুল্লাহ", খুলনা, ১৯৬৯, পৃঃ ৩৬।

২. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪-২৩৫।

৩. মুজীবুর রহমান, মওলানা, "মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর রোজনামচা", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃঃ ভূমিকা দ্র. ; "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৮০।

৪. ঐ, পৃঃ ১৭৫-১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

আখ্যায়িত করা হয়েছে। বিষয়টির প্রমান পাওয়া যায়, শায়খুল হিন্দ কর্তৃক সংগৃহীত "গালিবনামা" ও "আনোয়ারনাম" এবং সেগুলোর ফটোকপি ভারতবর্ষে ও অন্যান্য স্থানে বিলি করার ক্ষেত্রে কাগজ ব্যবহার করার দ্বারা । এতে ধারণা করা হয় যে, রেশমী রুমালের ব্যবহার শুধু মাত্র একবারই হয়েছে। যা মাওলানা সিন্ধী করেছিলেন। শায়খুল হিন্দের শাগরিদ শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) বলেন, " মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর আর্ন্তজাতিক কূটনৈতিক তৎপরতা মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভারতবর্ষে যে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে "রেশমী রুমাল" বা "রেশমী চিঠি আন্দোলন" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে [১]।

জর্জ রাউলাট কমিটির রির্পোটেও মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তৎপরতা এবং রেশমী রুমালপত্র বা রেশমী রুমাল আন্দোলন বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অসন্তোষ ও অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে এর কারণ তদন্তের জন্য ১৯১৭ খৃ: বৃটিশ সরকার "জর্জ রাউলাট" নামক একজন ইংরেজ বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ভারতে পাঠানো হয়। এ কমিটি ভারতের অনেক গুপ্ত রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে এক দীর্ঘ তদন্ত রির্পোট পেশ করে। "রাউলাট রির্পোট" নামে খ্যাত ঐ রির্পোটের ১৬৪ অনুচ্ছেদে "রেশমী চিঠি আন্দোলন " (Silk letter movement) সর্ম্পকে বলা হয় ঃ " সে রেশমী চিঠির ঘটনা সর্ব প্রথম উৎঘাটিত হয় ১৯১৬ খৃ: আগষ্ট মাসে। উক্ত রির্পোটে উল্লেখ করা হয় যে, রেশমী চিঠি আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে ছিল, একই সাথে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গোলযোগ এবং ভারতের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ভারত থেকে বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটানো । যা দেশে ইসলামী আন্দোলন হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল। আন্দোলনকে সফল করার জন্য মাওলানা উবায়দুল্লাহ ১৯১৫ খৃ: আগষ্টে তাঁর তিনজন সাথীসহ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন । সাথী তিনজন হলেন, আব্দুল্লাহ, ফাতেহ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ আলী । মাওলানা উবায়দুল্লাহ ছিলেন শিখ ধর্মান্তরিত মুসলমান । উত্তর প্রদেশের সাহারনপুর জেলার দেওবন্দ মাদ্রাসা হতে ধর্মীয় শিক্ষালাভ করেন। দেওবন্দে তিনি কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহের বিষ ছড়িয়ে দেন । যাদের উপর তিনি নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন, তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার দীর্ঘ দিনের প্রধান শিক্ষক মাওলানা মাহমূদ হাসান[২]। মাওলানা উবায়দুল্লাহ চেয়েছিলেন, বিশ্ববিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত উল্লেখ্যযোগ্য আলিমদের নিয়ে বৃটিশ বিরোধী এক বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন (প্যান ইসলামীজম) গড়ে তোলা। কিন্তু তাঁর এ

---

১. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ:২২১-২২৭।

২. রাউলাট রির্পোটের একথা সত্য নয়; বরং সত্যটি হল, শায়খুল হিন্দ মাওলানা সিন্ধীকে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য প্রভাবান্বিত করেছিলেন। ("নকশ্ –এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ২৩৯।)

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা দেওবন্দের মুহতামিম এবং পরামর্শসভার সদস্যদের দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয় । তারা তাঁকে ও তাঁর সহযোগীকে প্রত্যাখান করেন । মাওলানা মাহমূদ হাসান সর্বদা দেওবন্দে অবস্থান করতেন এবং মাওলানা সিন্ধীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মাহমূদ হাসানের বাড়ীতে গোপন বৈঠক বসত । আরো জানা গেছে যে, সীমান্তের কিছু লোকজন এসে এখানে অংশগ্রহণ করতেন । ১৯১৫ খৃঃ ৮ সেপ্টেম্বর মাওলানা মাহমূদ হাসান, মুহাম্মদ মিয়াঁ নামক এক ব্যক্তি ও তাঁর আরো কিছু বন্ধুসহ মাওলানা উবায়দুল্লাহর পরামর্শক্রমে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। কিন্তু এলোকটি উত্তর দিকের যাত্রার পরিবর্তে আরব দেশের হেযাযে পৌছেন। উবায়দুল্লাহ ভারত ত্যাগ করার পূর্বে দিল্লীতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং দু'টি পুস্তক প্রকাশ করেন। যে গুলোতে তিনি বিদ্রোহের আহবান জানিয়ে ভারতের মুসলমানদেরকে জিহাদের দায়িত্ব সর্ম্পকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এ ব্যক্তিটি (মাওলানা উবায়দুল্লাহ) তাঁর অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে ও মাওলানার (শায়খুল হিন্দ) প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, একই সময়ে বৃটিশ ভারতের উপর বহির্দেশ থেকে হামলা চালাবে এবং ভারতের অভ্যর্ন্তরে মুসলমানগণও বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেবে। যে যুদ্ধ জিহাদকে তারা বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তার বিবরণ হলঃ উবায়দুল্লাহ এবং তার সঙ্গীগণ প্রথমে ভারতের মুজাহিদদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর কাবুলে পৌছেন । সেখানে তিনি তুর্কী- জার্মান মিশনের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আন্তরিক সর্ম্পক গড়ে তোলেন। কিছু দিন পর তাঁর দেওবন্দের সাথী মৌলবী মুহাম্মদ মিয়াঁ আনসারী তাঁর সাথে যোগদেন । যিনি মাওলানা মাহমূদ হাসানের সাথে মক্কায় গমন করেছিলেন এবং সেখান থেকে জিহাদের ঘোষণাপত্র নিয়ে ১৯১৬ খৃঃ দেশে ফিরে আসেন । সেটিকে মাওলানা (মাহমূদ হাসান) হেযাযের তুর্কী সামরিক অফিসার গালিব পাশার নিকট থেকে অর্জন করেছিলেন । ঐ দলীলপত্র "গালিবনামা" হিসেবে প্রসিদ্ধী লাভ করেছিল। মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ গালিবনামা সম্বলিত প্রচারপত্রগুলো ভারতের অভ্যন্তরে ও সীমান্ত এলাকার গোত্রদের মধ্যে বিতরণ করেন। উবায়দুল্লাহ ও তাঁর সহযোগীরা বৃটিশ ভারত সরকার উৎখাত পর ভারতে একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের নীলনক্সা প্রণয়ন করেন। সে অস্থায়ী সরকারের পরিকল্পনামতে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ এর প্রেসিডেন্ট হবার কথা ছিল । তিনি (মহেন্দ্র প্রতাপ) হলেন, একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের উদ্যমী সন্তান । ১৯১৪ খৃ; শেষের দিকে তাকে ইটালী, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণকরার পাসর্পোট প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি সরাসরি জেনেভায় চলে যান এবং সেখানে নিন্দীত নেতা হরদয়ালের সাথে সাক্ষাৎ করেন। হরদয়াল তাকে নিয়ে জার্মান কাউন্সিলে যান। সেখান থেকে তিনি বার্লিন আসেন। বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে, তিনি জার্মানীদেরকে নিজের পরিকল্পনা বিষয়ে প্রভাবান্বিত করেছেন। তাকে একটি বিশেষ মিশনের সদস্য করে কাবুলে পাঠানো হয়। মাওলানা উবায়দুল্লাহকে ভারতমন্ত্রী (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), মাওলানা বরকতউল্লাহকে প্রধানমন্ত্রী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মাওলানা বরকতউল্লাহ ছিলেন কৃষ্ণ বরমার বন্ধু এবং আমেরিকান গদর পার্টির সদস্য । তিনি বার্লিন হয়ে কাবুলে আসেন । তিনি ছিলেন ভূপাল

Dhaka University Institutional Repository

রাজ্যের একজন কর্মকর্তার সন্তান । ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং জাপান ভ্রমণ করেন। টোকিওতে ভারতীয় ভাষার অধ্যাপক হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। সেখানে তিনি বৃটিশ বিরোধী "ইসলামী ভ্রাতৃত্ব" (The Islamic fraternity) নামে একটি মুখপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু এর প্রচার জাপানীদের দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয় এবং তাকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তখন তিনি জাপান ত্যাগ করে আমেরিকান গদর পার্টির সদস্যগণের সাথে যোগদেন। ১৯১৬ খৃঃ শুরুতে জার্মান মিশন তাদের উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করে। তবে ভারতীয়রা (প্রতিনিধিগণ) সেখানে থেকেই গেলেন। কাবুলের প্রাদেশিক সরকার রাশিয়ার জার সরকার ও তুর্কীস্তান সরকাররের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। যেগুলোতে (পত্র) রাশিয়াকে আহবান করা হয়েছিল, বৃটিশের পক্ষ ত্যাগ করতে এবং ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের পতন ঘটাতে তাদেরকে সাহায্য করতে। পত্রসমূহে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের স্বাক্ষর ছিল। পরবর্তীতে এ পত্রসমূহ বৃটিশের হস্তগত হয়। জার সরকারের নিকট দেয়া পত্রটি ছিল স্বর্ণের প্লেটে খচিত। এর একটি প্রতিচিত্র আমাদেরকেও দেখানো হয়েছে । প্রাদেশিক সরকারের একটি প্রস্তাব ছিল, তুর্কী সরকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। সে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মাওলানা উবায়দুল্লাহ তার পুরনো বন্ধু মাওলানা মাহমূদ হাসান (শায়খুল হিন্দ)-এর নামে পত্র লিখেন। ঐ পত্রটি অপর একটি পত্রের সাথে যেটি ১৯১৬খৃঃ ৯ জুলাই (৮রমযান) মুহাম্মদ মিয়াঁ আনসারী লিখেছিলেন। পত্র দু'টোকে একসাথে করে একটি খামে ভরে হায়দারাবাদের শেখ আব্দুর রহীম সিন্ধীর নিকট পাঠানো হয়। শেখ আব্দুর রহীম তখন থেকে আত্মগোপন করে আছেন। চিঠির খামের উপর লিখিতভাবে তিনি শেখ আব্দুর রহীমকে আবদার করেছিলেন, ঐ পত্রটি যেন কোন নির্ভরযোগ্য হাজী সাহেবের মাধ্যমে মক্কায় মাওলানা মাহমূদ হাসানের নিকট পাঠানো হয়। যদি নির্ভরযোগ্য কোন হাজী সাহেব না পাওয়া যায় তাহলে শেখ সাহেব নিজেই যেন একাজটি সম্পন্ন করেন। মাহমূদ হাসানের নিকট পাঠানো পত্রটি বৃটিশের হস্তগত হয়েছিল । সেটি আমরাও দেখেছি। ঐ পত্রটি পরিস্কার অক্ষরে হলুদ রেশমী রুমালে লিখিত ছিল। মুহাম্মদ মিয়াঁর চিঠিতে এখানে (কাবুল) জার্মান ও তুর্কী মিশনের আগমন, জার্মান মিশনের প্রত্যাবর্তন এবং তুর্কী মিশন এখানেই অবস্থান করছে বলে লিখা ছিল। কাবুলে অবস্থিত দেশত্যাগী মুহাজির ছাত্রদের ঘটনা ও গালিবনামা প্রচারের আলোচনাও ছিল । এছাড়া অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং হিজবুল্লাহ সৈন্যবাহিনী গঠন বিষয়েও উল্লেখ ছিল। এই হিজবুল্লাহ সৈন্যরা হবে ভারতবাসী। এর কাজ হবে মুসলিম দেশ ও শাসকগণের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টির চেষ্টা করা। মাওলানা মাহমূদ হাসানের নিকট আবেদন করা হয়েছিল, তিনি যেন তুরস্কের উসমানী খিলাফতের নিকট এসব বিষয়ে অবহিত করেন । মাওলানা উবায়দুল্লাহর পত্রে হিজবুল্লাহ গঠনের পূর্ণ চিত্র বর্ণিত ছিল। এই হিজবুল্লাহর সদর দপ্তর মদীনায় স্থাপনের ইচ্ছা ছিল। মাওলানা মাহমূদ হাসানকে এর প্রধান সেনাপতি বানানোর কথা ছিল । অন্যান্য সদরদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে কনস্টান্টিনোপল, তেহরান ও কাবুলে। কাবুলের সেনাপতি হবেন, উবায়দুল্লাহ নিজে । এর তালিকায় তিনজন

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠপোষক, বারজন জেনারেল এবং কয়েকজন উচ্চপদস্ত সৈনিকের নাম উল্লেখ ছিল। লাহোরের ছাত্রদের মধ্যে একজন মেজর জেনারেল , একজন কর্ণেল এবং ছয়জন ল্যাফটেনেন্ট কর্ণেল হবার কথা ছিল । এই উচ্চ পদের জন্য যে কয়জন ব্যক্তির নাম ছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশের সাথে নিয়োগ বিষয়ে কোন সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ করা হয়নি। কিন্তু এসমূহ সংবাদ ও গঠনাদি যা রেশমীপত্রে দেয়া হয়েছিল, তা উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মনঃপূত হয় এবং তারা সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খৃঃ ডিসেম্বরে মাওলানা মাহমূদ হাসান এবং তার চারজন বন্ধু বৃটিশের হাতে গ্রেফতার হন। তারা এখন বৃটিশের নিকট যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রেফতার আছেন। গালিবনামায় দস্তখতকারী গালিবপাশা বিদ্রোহী হিসেবে তাদের সাথে বন্দী আছেন । গালিবপাশা একথা স্বীকার করেছেন যে, মাহমূদ হাসানের পার্টি আমার নিকট একটি আবেদনপত্র রেখে ছিল, তাই আমি এর উপর দস্তখত করেছি। এ পত্রের উল্লেখযোগ্য অংশের অনুবাদ হলঃ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মুসলমানগণ নিজেরা সবধরণের যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত্ব হয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য ঝাপিয়ে পড়েছে। আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তুর্কী সৈন্য বাহিনী এবং ইসলামী মুজাহিদগণ ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে। সুতরাং হে মুসলমান ভাইগণ! তোমরা যে খৃষ্টান রাজশক্তির কবলে পতিত হয়েছ, তার উপর হামলা কর। দুশমনদের নিঃশেষ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অতিশীঘ্র চালিয়ে যাও। এদের উপর নিজেদের ঘৃণ্য শত্রুতার বিষয়টি জানিয়ে দাও। তোমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, মৌলবী মাহমূদ হাসান আপেনদি পূর্বে যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তিনি আমাদের নিকট এসেছেন এবং আমাদের পরামর্শ কামনা করেছেন। এক্ষেত্রে আমরা তাঁর সাথে সম্মতি প্রকাশ করছি এবং তাঁকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছি । যদি সে তোমাদের নিকট আসে, তাহলে তার উপর ভরসা রাখবে এবং তাঁকে অর্থ, জনবল ও সবধরনের প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করবে"[১] ।

(ঙ) আফগানিস্তান ত্যাগ এবং রাশিয়া, তুরস্ক ও মক্কায় গমন

তৃতীয় ইঙ্গ -আফগান যুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে মাওলানা সিন্ধী আমীর আমান উল্লাহর সরকারে যেমনিভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আফগান সরকারের কল্যাণসাধন করছিলেন, তেমনিভাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন । আমান উল্লাহর শাসনামলে তিন বছর আট মাস আর প্রথম থেকে সাত বছর সাত দিন কাবুলে অবস্থান করার পর আমান উল্লাহর উপর বৃটিশের চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি আফগানিস্তান ত্যাগ করেন। মাওলানা যাফর হাসান বলেন,"মাওলানা সিন্ধী অক্টোবর ১৯২২ খৃঃ পর্যন্ত আফগানিস্তানে অবস্থান করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেন। অতঃপর আমান উল্লাহ খানের উপর বৃটিশের চাপ অব্যাহত থাকলে তিনি ১৯২২ খৃঃ ২২ অক্টোবর কাবুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

---

১. Rowlatt Sedition Commtitee Report, 1918, Chapter XIV, Pp. 125-127; "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩৮-২৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

কাবুলে জিহাদের ময়দানকে যিনি সরগরম রাখতেন, তাঁকে নীরবে নিঃশব্দে কাবুল ছেড়ে চলে যেতে হয়[১]। মাওলানা সিন্ধী শুধু একাই কাবুল ত্যাগ করেননি; বরং শত শত দেশপ্রেমিক মুজাহিদ যারা তুরস্কের উসমানীয় খিলাফত রক্ষা করতে বা মাতৃভূমি ভারতকে স্বাধীন করতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেন এবং সীমান্তে যুদ্ধ করেন, তাদের অনেকেই আস্তে আস্তে কাবুল ত্যাগ করেন। কেউ রাশিয়া যেয়ে সমাজ বিপ্লবের দীক্ষা নেন, কেউবা ইয়াগীস্তান এসে যুদ্ধ করতে করতে জীবন দেন, কেউবা বৃটিশের অনুগত হয়ে ভারতে ফিরেন, কেউবা ধর-পাকড়ের ভয়ে চির আত্মগোপন করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন[২]। সিন্ধীর কাবুল ত্যাগের পর তাঁর সহকারীগণ যে নাম মাত্র অস্থায়ী ভারত সরকার জেইয়ে রেখেছিলেন, তাও শেষ পর্যন্ত আর্ন্তজাতিক রাজনীতির চাপের মুখে আমীর আমান উল্লাহ খান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন[৩]। উল্লেখ্য, সিন্ধীর কাবুল ত্যাগের পর আমীর আমান উল্লাহ খান বেশী দিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেননি; বরং ইংরেজ ষড়যন্ত্রের কারণে কাবুল ছেড়ে রোমে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন (১৯২৯খৃঃ)[৪]।

কাবুলে অবস্থানকালীন সময়ে মাওলানা সিন্ধী জুনূদ্দুল্লাহ সংগঠন ও অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যে সব উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন তা হলঃ

১. জার্মান মিশনের মেম্বারদেরকে ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দিতে সক্ষম হন ।

২. রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হন।

৩. রাশিয়া, জাপান ও তুর্কী মিশনে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে এবং উত্তম ব্যবস্থাপনার দ্বারা তাদের সজ্জিত করেন। যদিও নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে মিশনসমূহ ব্যর্থ হয়েছে।

৪. নিজের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব দিয়ে আফগান শাসকদেরকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে সক্ষম হন ।

৫. আমীর আমান উল্লাহ খানের উপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার করেন যে, বাদশা হওয়ার পরও আমীর আমান উল্লাহ আফগানিস্তানের সকল বিষয়ে মাওলানা সিন্ধীর পরামর্শকে গুরুত্ব দেন ।

৬. তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে তিনি আফগান পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন এবং নিজের বাহিনীকে (জুনূদুল্লাহ) যুদ্ধে প্রেরণ করেন। সে যুদ্ধে আফগানিস্তান জয় লাভ করে । বৃটিশ আফগানিস্তানের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয় ।

---

১. "নকশ্-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৭৭।

২. যাফর হাসান, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৮ ; "নকশ্-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৭৭।

৩-৪. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ভারতবর্ষের মুহাজির তুরুণদেরকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এত সক্রিয় ও শক্তিশালী করে তোলেন যে, আফগান সরকারকে সকল প্রকার সাহায্য করতে তাঁর কোন প্রকার বেগ পেতে হয়নি।

৮. আমীর আমান উল্লাহ খানের দরবারে শায়খুল হিন্দের মর্যাদা ও আন্দোলনকে অনেক উর্দ্ধে তুলে ধরতে সক্ষম হন[১]।

সিন্ধী ১৯২২খৃঃ ১৫ অক্টোবর কাবুল ত্যাগের পাসর্পোট লাভ করেন এবং ২২ অক্টোবর কাবুল ত্যগ করে[২] তুরস্ক যাবার পথে সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে ১৯২২ খৃঃ নভেম্বরে সোভিয়েত রাশিয়ার "তিরমিজ"-এ পৌছেন। রাশিয়ায় তখন জারের শাসন খতম হয়েছে। ১৯১৭ খৃঃ নভেম্বর থেকে রাশিয়ায় লেনিন (১৮৭০-১৯২৪খৃঃ)-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে নতুন মতবাদ ও নতুন জীবনধারার জোয়ার নামে । সমাজবাদী রাশিয়ার উত্থান তখন জোর কদমে চলছে । সিন্ধী রাশিয়ায় সাত মাস অবস্থান করে লেলিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সোশ্যালিজম সর্ম্পকে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেই জীবনধারায় বেশ প্রভাবান্বিত হন। তিনি সেখানে সমাজবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা দেখতে পেয়ে নিজে অনুপ্রাণিত হন। সেখানে অবস্থান করে আর্ন্তজাতিক রাজনৈতিক গতিধারাও পর্যবেক্ষণ করেন[৩]। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাথে তাঁর সর্ম্পক রয়েছে এবং এর প্রতিনিধি হিসেবে রাশিয়া গিয়েছেন বিধায়, রুশ সরকার তাঁকে একজন সম্মানিত মেহমান হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি জার- এর শাসনামলে কি কি দোষ ও দুর্বলতা ছিল, যার কারণে তার পতন হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের কি কি গুণ ও কারণ রয়েছে, যে কারণে সে বিজিত হয়েছে, পৃথিবীতে এর কি প্রভাব পড়ছে; তা উপলব্ধির চেষ্টা করেন[৪]। সমাজতন্ত্র সর্ম্পকে অধ্যয়ন করতে সব ধরণের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন। তাঁর সহযোগী ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম যুবকগণ অনুবাদের মাধ্যমে সমাজবাদ অনুধাবনে তাঁকে সাহায্য করেন। কারণ, তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতেন না । তিনি সেখানে সমাজবাদী নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পান। সিন্ধী সমাজবাদ বিষয়ে রাশিয়ার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের অসাধারণ কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ ও প্রভাবান্বিত হন বটে; কিন্তু সমাজবাদের ধর্মহীনতায় শংকিত হন। যেহেতু নতুন রাশিয়ার সমাজবাদ ছিল ধর্মহীনতার উপর, আর মাওলানা সিন্ধী ছিলেন খাঁটি মুসলমান। তাই ইসলামের প্রতি তার অবিচল অটল ভক্তিতে কোন ফাটল সৃষ্টি হয়নি। সিন্ধী রাশিয়ার সমাজবাদ ভারতে বহন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সাথে সাথে সমাজতন্ত্রের ধর্মহীনতার অভিশাপ থেকে বাঁচার চিন্তাও

---

১. মুজীবুর রহমান, মওলানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬

২. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪৯।

৩. ঐ, পৃঃ ১৭৭-১৭৮।

৪. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, মাওলানা, "মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী আওর উনকে নাকিদ", মাকতবা-এ রাহমানিয়া দেওবন্দ, ১৯৭২, পৃঃ ৩৭-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি সাম্যবাদী আর্দশের ভাল দিকগুলোর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেন এবং কোন ইসলামী দেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে তা কিভাবে করতে হবে, এসব বিষয়ে গবেষণা করেন[১]। সিন্ধীর ভাষায়, "সোশ্যালিজম সর্ম্পকে পড়া-শুনার ফল এ দাঁড়াল যে, আমি আমার ধর্মীয় আন্দোলন যা ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহর দশর্নের একটি শাখার ভিত্তিতে রচনা করেছিলাম, তাকে যুগের এই ধর্মহীনতার হামলা থেকে কি ভাবে রক্ষা করা যায়, তার কৌশল উদ্ভাবনে সক্ষম হই[২]"।

রাশিয়ায় সাত মাস অবস্থান করার পর সিন্ধী তাঁর সাথী মাওলানা যুফার হাসান সহ ১৯২৩ খৃঃ আংকারায় পৌছেন। মস্কোর তুর্কী রাষ্ট্রদূত ও রুশ পররাষ্ট্র দপ্তর মিলে তাঁদের সফরের ব্যবস্থা করেন এবং পথনির্দেশ করে দেন। ফলে বৃটিশ গোয়েন্দারা তাঁদের এ সফর সর্ম্পকে জানতে পারেনি[৩]। অতপর আংকারা থেকে ইস্তাম্বুল গমন করেন। ইস্তাম্বুলে তখন আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা কামাল পাশার রাজত্ব। সেখানে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল।

১৯২৪ খৃঃ ৩ মার্চ কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮ খৃঃ) তুরস্কে ইসলামী খিলাফত প্রথা উঠিয়ে দিয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এতে মুসলিম বিশ্বের শেষ ভরসাস্থল তুরস্কের পতন হয় । সেখানে আরবী অক্ষরের পরির্বতে রোমান অক্ষর এবং ইউরোপীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি , পোশাক-পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতি চালু করা হয়। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কারমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সিন্ধী তিন বছর (১৯২৩-১৯২৬ খৃঃ) তুরস্কে অবস্থান করে কামাল পাশার আধুনিক তুরস্ক ও ধর্ম -নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ পর্যবেক্ষণ করেন এবং সে জাতীয়তাবাদ ও সংস্কার আন্দোলন দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। তখন তিনি ভারতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেন[৪]। তুরস্কে তিনি ইসলামী ঐক্য (প্যান ইসলামাবাদ) বিষয়ে অধ্যয়ন করেন । তখন তিনি অনুভব করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বে কোথাও প্যান ইসলামাবাদের কোন কেন্দ্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। তাই তুর্কীদের ন্যায় বর্হিদেশের সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তাঁর ইসলামী আন্দোলনকে "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস"-এর অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সে উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের অধীন "সর্বরাজ্য পার্টি " নামে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ভাবলেন, ইসলামী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে হলে কংগ্রেসের অধীনেই করতে হবে[৫]। কংগ্রেসের অধীন তাঁর ঐ ধর্মীয় আন্দোলন যাতে বিরোধী শক্তির আক্রমণ ও ঝড়ঝাপটা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং ইউরোপেও ইসলামের প্রচার বৃদ্ধি পায়; সে উদ্দেশ্যে (কংগ্রেসের অধীন) তাঁর দলের

---

১. ঐ, পৃঃ ৩৮; সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।

২. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৭-৪০৮।

৩. "নকশ্– এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪৭।

৪. সারওয়ার মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

৫. "নকশ-এ হায়াত",২য় খন্ড, পৃঃ ১৪৭;'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৮।

Dhaka University Institutional Repository

(সর্বরাজ্য পার্টি) রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচী বিষয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সে আদর্শ ও কর্মসূচীকে মাওলানা যুফার হাসানের সহযোগিতায় এবং তুরস্ক সরকারের অনুমতিক্রমে ইস্তাম্বুল থেকে উর্দূতে প্রকাশ করেন। সিন্ধীর অনেক হিন্দু বন্ধু উর্দূ পড়তে জানতেন না বিধায় এর ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করেন। যুফার হাসান তুর্কী ভাষায় এর অনুবাদ করে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, তুর্কী সরকার যেন বুঝতে পারেন যে, সিন্ধী ও তাঁর সর্বরাজ্য পার্টি তুর্কী সরকারের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা রাখেনা; বরং তাদের উদ্দেশ্য, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা । এভাবে তিনি ইউরোপের সামনে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেন[১] । মাওলানা সিন্ধী এর কিছু কপি গোপনে ডাকযোগে ভারতের নেতৃবৃন্দের নামে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেগুলো বৃটিশ ভারতের হাতে ধরা পড়লে, এর প্রবেশ ও প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়। বৃটিশ সরকারের ঐ নিষেধাজ্ঞা লাহোর থেকে প্রকাশিত "জমিদার" ও "সিয়াসত" পত্রিকায় ১৯২৫খৃ: ১৮ মে প্রকাশিত হয়। নিষেধাজ্ঞাটি ছিল নিম্নরূপ: "একটি পুস্তিকার প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা । সিমলা ১৫ মে । সামুদ্রিক শুল্ক নীতির আওতায় সরকার ভারতে একটি উর্দূ পুস্তিকা ও এর অনুবাদ প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ পুস্তিকার নাম " ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ২য় রূপ । অথবা কাবুলে কংগ্রেস কমিটির প্রতিষ্ঠা এবং মহাভারত সর্বরাজ্য পার্টির কর্মসূচী"। এই পুস্তিকাটি লিখেছেন , উবায়দুল্লাহ ও যুফার হাসান । পুস্তিকাটি ইস্তাম্বুলের মাহমূদ-বে প্রেস ১৯২৪ খৃ: প্রকাশ করেছে। উক্ত ব্যক্তিদ্বয় হলেন, যথাক্রমে কাবুল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী"[২] ।

সিন্ধী ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচী বিষয়ে লালা লাজপত রায়ের সংগে সরাসরি কথা বলেন ও মতবিনিময় করেন। তদ্রূপ ডঃ আনসারীর সাথেও পত্র মাধ্যমে বিস্তারিত কথা বলেন। কিন্তু তাঁদের কেউই সিন্ধীর ঐ কর্মসূচীকে পছন্দ করেননি। সিন্ধী বলেন, "ইস্তাম্বুলে লালা লাজপত রায়ের সংগে আমার মতবিনিময় হয়েছে। তদ্রূপ ডঃ আনসারীর সাথেও আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আমার মুরুব্বীগণ আমার এই পরিকল্পনাকে পছন্দ করেননি। আবার এর বিপরীতে বিছু বলতেও পারেননি। পরন্তু তারা চেষ্টা করেছেন আমাকে আরো হাজার/ দু'হাজার বছর পিছিয়ে নিতে । তবে পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুর নিকট আমার এ পরিকল্পনা ভাল লেগেছিল বিধায় তিনি দু'একটি কথা লিখেছিলেন । সেটি আমার জন্য একান্ত আনন্দের বিষয়[৩]" ।

---

১. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬২ ; নকশ-এ হায়াত, ২য় খন্ড, পৃ: ১৪৭।

২. আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, ড.,"মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীঃ জীবন ও কর্ম", ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ: ৬৩-৬৪ ; নকশ-এ হায়াত, ২য় খন্ড, পৃ: ১৪৭।

৩. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০৮; নকশ-এ হায়াত, ২য় খন্ড, পৃ: ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৪৪ হিঃ / ১৯২৫খৃঃ হজ্ব মৌসুমে পবিত্র মক্কায় খিলাফতের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা কামাল পাশা কর্তৃক খিলাফত প্রথা রহিত হবার (৩মার্চ ১৯২৪খৃঃ) তিন দিন পর মক্কার শরীফ হুসাইন নিজেকে ইসলামের খলীফা বলে দাবী করেন। কিন্তু ১৯২৪ খৃঃ নভেম্বরে ওয়াহাবী মতাবলম্বী ইবন্ সউদ তায়েফে আক্রমণ করলে শরীফ হুসাইন বৃটিশ জাহাজযোগে সাইপ্রাস পলায়ন করেন।ইবন্ সউদ মক্কার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি খিলাফত অধিবেশন আহবান করেন । সে অধিবেশনে ভারতসহ মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিগণ সমবেত হন। মাওলানা সিন্ধীর বন্ধুরাও সেখানে উপস্থিত হন । তাই তিনি ভারতীয় বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ইটালীর পথ ধরে মক্কায় পৌছার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ অধিবেশন শেষ হওয়ার পর ১৩৪৫হিঃ সফর/ ১৯২৬ খৃঃ আগস্টে তিনি ইটালী ও সুইজারল্যান্ড হয়ে মক্কায় পৌছতে সক্ষম হন। সিন্ধী তাঁর রাজনৈতিক নাজুক অবস্থা সর্ম্পকে ভালভাবেই অবগত ছিলেন। তাই হেযাযের গভর্ণরকে আশ্বাস দিলেন, আমি এখানে কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ড করব না"। এতে হেযায সরকার তাঁকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেননি; বরং জাতীয়তাবাদী মনে করেন। সেখানে তিনি নিজেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দেন। সিন্ধী এভাবে এক ধরনের নিরাপত্তা লাভ করেন। হেযায সরকার তাঁকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেন এবং ছোটখাট বিষয়ে সাহায্য চাইলে তা পূরণ করেন [১]। ইবন্ সউদ মক্কার শরীফ হুসাইনকে পরাস্ত করে হেযাযের শাসনক্ষমতা হাতে নিলে ভারতবর্ষের আলিমগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। লখনৌর মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গি মহল্লীর (১৮৭৮-১৯২৬খৃঃ) নেতৃত্বে আলিমগণ শরীফ হুসাইনকে সমর্থন দেন। পক্ষান্তরে মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও তার সমর্থকগণ ইবন্ সউদকে সমর্থন দেন। কিন্তু মাওলানা সিন্ধী তখন ভারতীয় আলিমগণের কোন পক্ষকে সমর্থন দেননি; বরং নিরপেক্ষ থাকেন।

মক্কায় দীর্ঘ বার বছর অবস্থান করে মাওলানা সিন্ধী লেখা-পড়া, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার আত্মনিয়োগ করেন । এ ক্ষেত্রে তিনি অনেকের সহায়তা পান। সিন্ধী বলেন, " তিনজন ভারতীয় এবং একটি আরব পরিবার দ্বারা জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি। এদের মধ্যে প্রথম শায়খ 'আব্দুল ওয়াহ্হাব দেহলবী , দ্বিতীয় 'আব্দুস সাত্তার বিন 'আব্দুল ওয়াহ্হাব দেহলবী, তৃতীয় আবুশ্ শরফ মুজাদ্দিদী। তাঁদের লাইব্রেরী থেকে ফায়দা উঠিয়েছি । আরব পরিবার দ্বারা উদ্দেশ্য, শায়খ মুহাম্মদ বিন 'আব্দুর রাযযাক বিন হামযাহ (শায়খুল হাদীস মক্কা) এবং শায়খ আবুস্সামে' 'আব্দুয যাহির ইমামুল হরমের পরিবার [২]" । সিন্ধী মক্কায় অবস্থান করে পবিত্র কুরআন শরীফ ও শাহ ওয়ালী উল্লাহর (র.) "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা" গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। পবিত্র কুরআনের তাফসীর বিষয়ে যে সব জায়গা ইতিপূর্বে

১-২. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৮-৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

কঠিন বলে মনে হয়েছিল, সে গুলোকে শাহ ওয়ালী উল্লাহর মূলনীতি অবলম্বনে আয়ত্ত করেন। তিনি দীর্ঘ দিন জ্ঞানসাধনার ফলে পবিত্র কুরআনে বাস্তব যুগোপযোগী একটি উচ্চ আদর্শ দেখতে পান। শাহ ওয়ালী উল্লাহর বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ যেমন -"বুদূরে বাযিগাহ" , "খায়রে কাসীর", "তাফহীমাতে ইলাহিয়াহ", "সাত'আত", "আলতাফুল কুদুস", "লুম'আত" ও "তা'বীলুল আহাদিস", গ্রন্থসমূহ মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করেন। এ সমূহ গ্রন্থের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে অনুধাবন করতে তিনি রফিউদ্দীন দেহলবী রচিত "তাকমীলুল আযহান" এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ রচিত "'আকাবাত " এবং মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম (র.) রচিত "কাসিমুল উলূম", "তাকরীরে দিলপযীর" এবং "আবে-হায়াত" গ্রন্থসমূহ সাহায্যকারী হিসেবে অধ্যয়ন করেন। এসব কিতাব তিনি অন্যদেরকেও শিক্ষা দেন। এর সাথে "মাদ্রাসায়ে কুরআনে হাকীম" চালাতে থাকেন। আল্লামা জারুল্লাহ মক্কায় মাওলানা সিন্ধীর নিকট শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শন অধ্যয়ন করেন [১]। আল্লামা জারুল্লাহ বলেন, মাওলানা সিন্ধী পুরো কুরআনের তাফসীর আরবীতে দেড়শ' দিনে বর্ণনা করেন। আল্লামা মূসা তা দু' হাজার চারশ' পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেন। এর ১ম খন্ডে (পৃ: ৩৪৪) সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারাহ স্থান পেয়েছে । যা করাচীস্থ বায়তুল হেকমত প্রকাশ করেছে । উক্ত তাফসীর ছাড়াও সিন্ধী "কুরআনী দস্তুরে ইনকিলাব" নামক অপর একটি গ্রন্থও রচনা করেন; যা ১৯৪৩ খৃ: লাহোর থেকে প্রকাশিত হয় [২]।

(চ) ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ভারতকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে কাবুল গমন করেন। কিন্তু তাঁর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও তিনি আর দেশে ফিরেননি; বরং দেশে ফেরার মত পরিবেশ ছিলনা। তাই মস্কো, আংকারা এবং মক্কায় ভ্রমণ ও অবস্থান করেন। এভাবে দীর্ঘ ২৪ বছর নির্বাসন জীবন কাটানোর পর ১৯৩৬ খৃ: থেকে "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস" সিন্ধীকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। সিন্ধীর বন্ধুরাও এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। সিন্ধীকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে রাজনৈতিক মতানৈক্য দূর হয়ে যায়; বরং সবাই চেষ্টা করেন। সিন্ধী দেশে ফেরার বিষয়ে কখনো নৈরাশ হয়েছিলেন। যেহেতু বৃটিশের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন বৃটিশ শাসন উৎখাতের মহান নেতা । সেজন্য কোন কোন বন্ধু তাঁকে দেশে না ফেরার পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) (১৮৭৮-১৯৫৭খৃ:) সিন্ধীকে দেশে ফেরার জন্য উৎসাহিত করেন। সে অনুযায়ী তিনি দরখাস্ত করেন। সিন্ধুর প্রাদেশিক সরকার তাঁর জন্য জামিন হন । এভাবে সকলের অব্যাহত চেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯৩৮খৃ: ১ নভেম্বর তিনি দেশে ফেরার অনুমতি লাভ করেন এবং ১ জানুয়ারী ১৯৩৯ খৃ: তাঁকে পাসর্পোট দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ বছর ৭ মার্চ হজ সম্পাদন শেষে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং করাচী বন্দরে অবতরণ করেন[৩]।

---

১. আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০৮-৪০৯।

২. "মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীঃ জীবন ও কর্ম", পৃ:৪০।

৩. সারওয়ার মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত,পৃ: ৭৩,৮০।

Dhaka University Institutional Repository

সিন্ধী ১৯৩৮ খৃঃ যখন দেশে ফেরার অনুমতি লাভ করেন এবং এ বিষয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর জীবনী প্রকাশ পেয়েছিল। প্রচারিত ঐসব রচনা, প্রবন্ধে তিনি কিছু ভুল- ভ্রান্তি দেখতে পান। সেগুলো সংশোধন নিমিত্ত "আত্মজীবনী" বা "জাতী ডায়েরী" রচনা করেন। মক্কায় অবস্থানকালেই তার আত্মজীবনী উপমহাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গোলাম রসূল সম্পাদিত "দৈনিক ইনকিলাব" পত্রিকায় প্রথম তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীটি প্রকাশ পেয়েছিল[১]। অতঃপর অন্যান্য প্রত্রিকাতেও তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়। সিন্ধী আত্মজীবনীতে আগামী দিনের কিছু কর্মসূচী বিষয়েও আভাস দেন। তিনি বলেন, দেশে ফিরে আমার প্রোগ্রাম এ ধরণের হবে আশা করছি ঃ

১. সর্বদা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাধারণ সদস্য হয়ে থাকব।

২. মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি অবলম্বন করব।

৩. ইমাম ওয়ালী উল্লাহর দর্শন শিক্ষা দেয়া, প্রচার করা এবং এর প্রতি জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে জেনারেল শিক্ষিত ও ধর্মীয় আলিমদেরকে আহবান করব। কোন হিন্দু বা খৃষ্টান এ দর্শন শিখতে চাইলে তাকে পূর্ণ সাহায্য করব।

৪. পরিস্থিতি কখনো অনুকূলে আসলে মাহত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি অবলম্বনে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে ইমাম ওয়ালী উল্লাহর চিন্তাধারার আলোকে অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য স্বতন্ত্র দল গঠনের কর্মসূচী পেশ করব"[২]।

সিন্ধী "সিন্ধীয়া স্টিম নেভিগেশন" কোম্পানীর হজ্ব যাত্রীবাহী জাহাজ "এস, এস, আলমদীনা"য় করে ৭ মার্চ ১৯৩৯খৃঃ করাচী আগমন করেন। তাঁকে সেখানে বিশেষ সম্বর্ধনা দেয়া হয়। জাহাজ থেকে অবতরণের পর সামরিক কায়দায় তাঁকে অভিবাদন জানানো হয়। সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাহ বখশ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলাহী বখশ্ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। "কংগ্রেস", "জমী'অতে উলামায়ে ইসলাম" ও "মুসলিমলীগ"-এর সাংবাদিকরা জাহাজ বন্দরে সমবেত হন। মাওলানা সিন্ধী সেখানে সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনতে তাঁর বিশেষ ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানান।

মাওলানা সিন্ধী করাচী বন্দরে অবতরণের পর ভারতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল চাচ্ছিল, তিনি যেন তাদের দলে যোগদান করেন। বিষয়টি মাওলানা সিন্ধীকে করাচী বন্দরে একরকম সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল। তখন তিনি মুসলিমলীগকে সম্পূর্ণ নৈরাশ করে দিয়ে জোরগলায় বলেন, " কংগ্রেস আমার স্বর্গ। আমি কখনো এর বাইরে যাবনা । সুদৃঢ় অভিমত ও

---

১. [৬]আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০৩।

২. ঐ,পৃ:৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনার পর অনেক বছর আগেই আমি কংগ্রেসের অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেছি। আমি কাবুলেও একটি কংগ্রেস কমিটি গঠন করেছিলাম। কংগ্রেসের একজন নগণ্য সেবক হিসেবে এর বাণী প্রচারে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করি। কারণ, কংগ্রেসের আদর্শ ভারতের মুক্তি । তবে কংগ্রেসে যদি এমন দেখি যে, আমার মতের অমিল রয়েছে, তাহলে আমি আমার নিজস্ব দল গঠন করব"। ঐ বিবৃতিতে তিনি আল্লাহর উপর আস্থা রেখে নিজেকে একজন আর্ন্তজাতিকতাবাদী বলে দাবী করে গোড়ামীর উর্ধ্বে থাকবেন বলে ঘোষণা দেন[১] । মোটকথা মাওলানা সিন্ধী করাচী বন্দরে অবতরণ পর সেখান থেকেই তাঁর মতামত প্রচার শুরু করেন। দীর্ঘ ২৪ বছরের প্রবাস জীবনে তাঁকে যে সংকটের মোকাবেলা করতে হয়েছে, সেসব কথা বলার জন্য ব্যাকুল হন।

সিন্ধী দেশে ফেরার পর সর্বপ্রথম ৩ জুন ১৯৩৯খৃ: কলিকাতায় অনুষ্ঠিত "জমী'অতে উলামায়ে হিন্দ"- এর প্রাদেশিক শাখা "উলামায়ে বাংগাল"-এর এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন । সে অধিবেশনে তিনি যে সব রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দল, সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অতঃপর ২৪ বছরের (১৯১৫-১৯৩৯খৃ:) নির্বাসন জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, " দুইশ' বছরের উন্নতির ফলে ইউরোপে যে নতুন বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, সে সর্ম্পকে ভারতবর্ষের জনগণ অনবহিত। ভারতের জনগণকে সেই বিপ্লবের অনুসরণ করতে হবে। ইউরোপের রাজনীতির আলোকে এদেশে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটাতে হবে। ভারতের কৃষক-মজুরদের জীবনের মান ইউরোপীয় কৃষক- মজুরদের সমতুল্য করতে হবে"। সে অধিবেশনে সিন্ধী ভারতীয় সভ্যতা ও ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং স্পষ্টভাবে বললেন, "ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা ও মুসলিম সভ্যতা উভয়টি ধর্ম ভিত্তিক । আর ইউরোপের বর্তমান আধুনিক সভ্যতা হল ধর্ম বিবর্জিত। এর ভিত্তি দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর । ভারতবর্ষে পরিবর্তন আনতে হলে ইউরোপীয় সভ্যতাকে বুঝতে হবে"[২]। সিন্ধী আরো বলেন, "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস"কে ভারতের সকল রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ধরে নেয়া উচিত। মুসলিম সমাজে মুসলিম লীগের ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকলেও তা কংগ্রেসের সমকক্ষ হতে পারেনা। এ দেশের ধর্মীয় পন্ডিতগণ নিজেদের ধর্মীয় দর্শনের সাথে ইউরোপীয় দর্শনের সমন্বয় সাধন করতে পারেন। শুধু ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানকে জাতীয় আন্দোলনে অংগীভূত করলেই দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবেনা। ইমাম ওয়ালী উল্লাহর বৈপ্লবিক রাজনৈতিক কর্মসূচী অবলম্বন করলে ইসলামের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক রক্ষা পাবে। ইউরোপের বিপ্লবীরাও তাঁর চিন্তাধারা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি । তাঁর রাজনীতি অনুধাবন করতে পারলে জমী'অতে উলামায়ে হিন্দের পক্ষে ইউরোপীয় বিপ্লব অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করা সহজ হবে[৩]।

---

১. "দৈনিক আজাদ", কলকাতা, ২৪ ফালগুন, ১৩৪৫/ ৮মার্চ ১৯৩৯ খৃ:,

২-৩. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৫-৮৬, ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

১০ ডিসেম্বর ১৯৩৯ খৃঃ মাওলানা সিন্ধী সিন্ধুকে সদর দপ্তর করে কংগ্রেসের অধীন " যমুনা নর্দমা সিন্ধসাগর পার্টি " নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তাঁর এ দলটি কাগজ -কলমেই ছিল। এর প্রসার হয়নি । এর তিনটি আঞ্চলিক উপদপ্তর রাখা হয় করাচী, লাহোর ও দিল্লীতে । সে পার্টির আর্দশ ও কর্মসূচী বর্ণনা করে তিনি ১৯৩৯ খৃঃ ১০ ডিসেম্বর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে তাঁর দলের নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। ঐ প্রবন্ধের সারকথা হলঃ

১. উপমহাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের ভাংগা-গড়ার পেছনে রয়েছে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য। উভয় ধর্মের মানবসেবকগণ শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনকে সামনে রেখে অগ্রসর হলে ভারত মিলন মোহনায় পরিণত হবে। এ দলের রাজনৈতিক দর্শন হল, অহিংস নীতি অবলম্বন করে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা । ভারতবর্ষের কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের অর্থনৈতিক অবস্থা ইউরোপের কৃষক, মজুর ও কারিগরদের সমপর্যায়ের করা।

২. ভারতকে একটি দেশ না ধরে সেটিকে ইউরোপের ন্যায় কয়েকটি দেশের যৌগিক বলে গণ্য করতে হবে। অভিন্ন ভাষা ও অভিন্ন আচার - অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে দেশের প্রদেশ গুলোকে পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে।

৩. নারী-পুরুষ সবাইকে সমঅধিকার দিতে হবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জাতীয়তাবাদের উন্নতি করতে হবে।

৪. সর্বসাধারণকে মাতৃভাষা শিক্ষা দিতে হবে। নাগরিকদেরকে তাদের অধিকার সর্ম্পকে সচেতন করতে হবে।

৫. ইউরোপের উন্নত শিল্পবিপ্লবকে ভারতবর্ষেও বাস্তবে রূপদান করতে হবে।

৬. চিন্তা, নৈতিকতা, রাজনীতি ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে শাহ ওয়ালী উল্লাহর (র.) দর্শনকে পার্টির যুক্তিসংগত আর্দশ বলে গণ্য করা হবে।

৭. গোটা ভারতবর্ষকে একটি ফেডারেশনের অধীনে নিয়ে আসতে হবে এবং ফেডারেশনের পূর্ণতা অর্জনের জন্য দীর্ঘ দিন বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর অধীন থাকতে হবে।

৮. উর্দূ বা ইংরেজীকে ফেডারেশনের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে[১]।

১২ জুলাই ১৯৪০খৃঃ মাওলানা সিন্ধী সিন্ধু প্রদেশের থট্টা জেলার কংগ্রেস কমিটির কনফারেন্সে লিখিত ভাষণে কংগ্রেসের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা ব্যক্ত করেন। ভাষণে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনে ১৮৫৭-এর বিপ্লবের পর দেওবন্দ মাদ্রাসার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। ঐ ভাষণে ইউরোপের উদার নীতি ও প্রযুক্তি নীতি সর্ম্পকে বলেন, " ভারতবাসীকে সে পথে ধাবিত হতে হবে"। তিনি ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের প্রশংসা করার সাথে

---

১. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৯-১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

সাথে এর একটি দুর্বল দিকও তুলে ধরে বলেন, সেখানে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাথে ধর্মের অনুশীলন নেই; বরং খোদাকে অস্বীকার করা হচ্ছে"। সিন্ধী ধর্ম ত্যাগ করতে পারবেন না, বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সে ধর্মহীনতা থেকে বাচঁতে হলে "ওয়াহ্দাতুল অজূদ"-এর প্রচার করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। কারণ ইহা হিন্দু দর্শনের ও সারকাথা । সেভাবে একজন বৈজ্ঞানিককেও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করানো সম্ভব । ঐ অধিবেশনে তিনি লখনৌ চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করেন। এর গলদসমূহ তুলে ধরেন। যেহেতু তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫খৃ:) চলছিল, তাই সে কনফারেন্সে তিনি স্পষ্টভাবে বৃটিশকে সাহায্য করার কথা বলেন। অতঃপর সিন্ধী তাঁর নবগঠিত "যমুনা নর্দমা সিন্ধী সাগর পার্টি" বিষয়ে আলোচনা করে বলেন, "এ পার্টিতে হিন্দু - মুসলিম বিভেদের সব পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গুলোতে মুসলমানদের অধিকার নিশ্চিত করা কংগ্রেসের কর্তব্য"। সিন্ধী তাঁর কর্মসূচী বিষয়ে বলেন, "কাবুলে তিনি সাত বছর ভারত জাতির স্বার্থে কাজ করেছেন, এখানেও তিনি পরীক্ষামূলকভাবে সাত বছর তাঁর সংস্কারমূলক কাজ করবেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গান্ধী, পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিকান্দার হায়াত খান বৃটিশকে সাহায্য করবেন বলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন; সে জন্য তিনি তাদের প্রশংসা করেন। ১৯৩০ খৃ: মহাত্মা গান্ধী যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন সে বিষয়ে সিন্ধী বলেন, "সে অসহযোগ আন্দোলন আর ১৯৪০খৃ: অসহযোগ আন্দোলন এক নয় [১]।

৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ খৃ: " আমরা কি চাই " শীর্ষক এক প্রবন্ধে মাওলানা সিন্ধী তাঁর " যমুনা নর্দমা সিন্ধ সাগর পার্টি"র নীতিমালা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। প্রবন্ধের শীর্ষভাগে তিনি ১৮৫৭'র স্বাধীনতা আন্দোলনের পর মুসলিম নেতৃবৃন্দ কিভাবে আলীগড় কেন্দ্রিক ও দেওবন্দ কেন্দ্রিক বিভক্ত হয়ে যায়, তার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আলীগড় সৃষ্টি করেছে মুসলিমলীগ আর দেওবন্দ সৃষ্টি করেছে জমী'অতে উলামায়ে হিন্দ"। ঐ প্রবন্ধে তিনি যে সকল মুসলিম শাসক ৬শ' বছর ভারতবর্ষে রাজত্ব করে সারা ভারতে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁদেরকে প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় বলেছেন এবং হিন্দুদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভারতীয় বলেছেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনের বিষয়ে প্রামানিক আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "শাসন ক্ষমতা হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে অনেক বেশী"। ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব থাকবে নাকি তা উৎখাত করা হবে,এ সর্ম্পকে সিন্ধী ঐ প্রবন্ধে বলেন, "যতদিন ভারতবাসী এ মর্মে নিশ্চিত না হবে যে, তারা লড়াই করে দেশ জয করতে পারবে, ততদিন অসহযোগ আন্দোলন বর্জন করতে হবে। চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত ছোট ছোট লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে রাজনৈতিক শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে" [২]।

---

১. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১১-১১৫।

২. ঐ, পৃ: ১৯৮,২০৪,২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪১ খৃঃ জুন মাসে মাদ্রাজ প্রদেশের "কুম্বাকুনাম"-এ পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আয়োজিত এক সমাবেশে মাওলানা সিন্ধী সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। ১৯৪০ খৃঃ ২৩ মার্চ লাহোরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ঐতিহাসিক "লাহোর প্রস্তাব" অর্থাৎ "পাকিস্তান প্রস্তাব" গৃহীত হয়। সিন্ধী ছিলেন লাহোর প্রস্তাবের বিরোধী । তাই তিনি কুম্বাকুনাম-এর জনসভায় সভাপতির ভাষণে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনারা ভারতবর্ষের কোন অংশকে পাকিস্তান বলবেন না। আপনারা পাকিস্তান স্কীম প্রণেতাদের কথা কানে আনবেননা"। সিন্ধী আরো বলেন, "কংগ্রেসের আওতায় অন্য একটি দল গঠন করতে হবে, যেমনটি তিনি করেছেন। এর দ্বারা দেশ রক্ষার কাজ করতে হবে। বৃটিশ গভর্মেন্ট থেকে ডমিনিয়ন স্টেটাস অর্জন করতে হবে"[২]।

১৯৪৪ খৃঃ মার্চে মাওলানা সিন্ধী উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করেন। দিল্লী থেকে দেওবন্দ, লুধিয়ানা ও কাসূর হয়ে তিনি লাহোরে উপনীত হন। তখন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন । অসুস্থতা নিয়েও তিনি সিন্ধু হায়দারাবাদের "জমী'অতে তোলাবায়ে আরাবিয়া"র বিশেষ অনুরোধে ১৯৪৪ খৃঃ ১৭ এপ্রিল হায়াদারাবাদে অনুষ্ঠিত তোলাবায়ে আরাবিয়ার সভায় সভাপতিত্ব করেন। এটাই ছিল সিন্ধীর জীবনে সভাসমিতিতে শেষ যোগদান। ঐ অধিবেশনে তিনি জিহাদের ব্যাখ্যায় বলেন, "জিহাদের দু'টি স্তর রয়েছে । কখনো মুসলমান বাদশাহর অধীনে থেকে জিহাদ করা ফরজ হয়ে যায়। আবার কখনো শাসন ক্ষমতা এবং সামরিক বাহিনী না থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের উপর জিহাদ করা ফরজ হয়ে যায়। তখন নিজেরা দল গঠন করে যুদ্ধে নামতে হয়। যাকে ইউরোপে বলে শিল্প বিপ্লব। আর সে বিপ্লবের জন্যই তিনি কংগ্রেসের অধীন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন"। সিন্ধী তোলাবায়ে আরাবিয়ার ঐ অধিবেশনে স্পষ্ট বলেন, "তিনি কংগ্রেসের অধীন থাকলেও মাওলানা হুসাই আহমদ মাদানী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদের ন্যায় মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী নন। গান্ধীর অহিংস নীতির সাথে তাঁর মিল আছে আবার গরমিলও আছে। কারণ গান্ধী কখনো সন্ত্রাস ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে চাননা । তবে সিন্ধী প্রয়োজনে তা করবেন। ইউরোপীয়রা যেভাবে তাদের বিপ্লবকে সুদৃঢ় করেছে, তিনিও শাহ ওয়ালী উল্লাহর (র.) ইনকিলাব প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। আর এ ইনকিলাবের শিক্ষা নিতে হবে ইউরোপ থেকে"। তিনি সাধারণ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমাদের উচিত ইংরেজী শিক্ষা করা । এতে তোমরা ইউরোপের বিপ্লব বুঝতে সক্ষম হবে"। আরবী মাদ্রাসার ছাত্রদের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, "প্রথমে দেওবন্দের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী কিতাবসমূহের পাঠ শেষ করবে, তার সাথে যুক্তি বিদ্যাও শিখবে। এতে শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শন বুঝতে সহজ হবে।

---

২. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪,১৩৮,১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি আরবী ছাত্রকে প্রাইভেটভাবে কিছু ইংরেজী শিখতে হবে"। সিন্ধী আরো বলেন, "আমি পরিস্কারভাবে জানাতে চাই যে, আমরা বৃটিশের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার চিন্তা বাদ দিয়েছি । বর্তমানে আমরা ডমিনিয়ন স্টেটাস অর্জন করতে চাই[১]।

সিন্ধী হায়দারাবাদের জলসায় যোগদানের পর অসুস্থতা সত্ত্বেও একজন সংগী নিয়ে ১৯৪৪ খৃঃ জুনে সিন্ধু প্রদেশের আরবী মাদ্রাসাসমূহ পরিদর্শনে যান। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে সফর কর্মসূচী বাতিল করে করাচীতে ফিরে আসেন। ১৯৪৪ খৃঃ ৪ আগষ্ট লারকানা জেলার শাহদাদ কোর্টে "মুহাম্মদ কাসিম ওয়ালী উল্লাহ থিয়লজিক্যাল স্কুল" -এর উদ্বোধন করবেন বলে ঘোষণা ছিল। কিন্তু অসুস্থতার কারণে ২ আগষ্ট তাঁর মুদ্রিত ভাষণ শাহদাদ কোর্টে পাঠিয়ে দেন। যা নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ করে শোনানো হয়। এটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ। সে ভাষণে তিনি বলেন, "এ দেশকে ইউরোপ থেকে সামরিক নীতি ও শিল্পনীতি ধার নিতে হবে। তবে সমাজবাদের শিক্ষা নিতে হবে ইমাম ওয়ালী উল্লাহ থেকে। যিনি ছিলেন দর্শন ও অর্থনীতি বিষয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর সমাজবাদই ইসলামের সংগে খাপ খায়"। তিনি আরো বলেন, "জীবনে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে হলে এদেশকে বৃটিশ কমনওয়েলথ'র অধীনে আরো দশ / বিশ বছর শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান ও জীবন যাপন করতে হবে[২]।

(ছ) মৃত্যু

করাচীতে অবস্থান করে মাওলানা সিন্ধী চিকিৎসা নিচ্ছিলেন । কিন্তু অসুখ বেড়েই চলে। এ সময় কন্যা ও দৌহিত্রদের অনুরোধে তিনি ভাওয়ালপুর স্টেটের দীনপুরে চলে যান এবং জীবনের শেষ দিন গুলো জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া দিল্লী ও ভাওয়ালপুরের দ্বীনপুরে কাটান । সেখানে তিনি ১৯৪৪ খৃঃ ২১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাযিউন। তাঁকে রহীম ইয়ারখান জেলার (পাঞ্জাব) খানপুরে সমাহিত করা হয়েছে[৩]।

---

১. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১-১৫৬,১৬৩-১৬৪।

২. ঐ, পৃঃ ১৭২-১৭৩,১৬৭-১৬৮।

৩. "দায়িরা-এ মা'আরিফে ইসলামিয়া", ১২ খন্ড, লাহোর, ১৯৭২, পৃঃ ৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৪
রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র:)-এর মনে রাজনৈতিক চেতনার বীজ অংকুরিত হয় ছোটকাল থেকেই। আস্তে আস্তে সে চেতনা রাজপথ ধরে বিস্ফোরিত হয়; বরং দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। সে চেতনা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করতে বৃটিশের মুখোমুখি সমরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, আর সে উদ্দেশ্যে বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিংগ ছড়িয়ে দেন ভারত থেকে কাবুল পর্যন্ত।কিন্তু জীবনের বার্ধক্যে সেই শাণিত চেতনায় বার্ধক্য এসে যায় । বৃটিশের বিরুদ্ধে হুংকার আর গর্জে ওঠেনি। সিন্ধীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় ছিলেন, বৃটিশ শাসন উৎখাতের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের শাণিত চেতনাধারী বলিষ্ঠ মুজাহিদ। কাবুলে গিয়ে হলেন, অস্থায়ী ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জুনূদুল্লাহ সংগঠনের অধিনায়ক। রাশিয়ায় গিয়ে হলেন, সমাজবাদের ভক্ত। তুরস্কে গিয়ে হলেন কামাল পাশার জাতীয়তাবাদ, সংস্কার আন্দোলন ও রোমান অক্ষরের প্রয়োগে মুগ্ধ। সৌদীআরবে গিয়ে হলেন, জ্ঞানসাধক ও শাহ ওয়ালী উল্লাহর আর্থ-সমাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিশ্লেষক। আর দেশে ফিরলেন একজন বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক সেজে। নির্বাসনোত্তর রাজনৈতিক জীবন হল অনেকটা রহস্যজনক।

সিন্ধী তাঁর রাজনৈতিক চেতনার সূচনা সর্ম্পকে বলেন, " আমি ছাত্র জীবনে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (র.) -এর জীবনচরিত পাঠ করি। তাই ইসলাম ধর্ম বিষয়ে অধ্যয়নের সূচনা কালেই মরহুম মাওলানার (ইসমাঈল শহীদ) সাথে আমার আন্তরিক সর্ম্পক সৃষ্টি হয়েছিল। দেওবন্দে লেখা-পড়া করার সময় তাঁর জীবনের অসংখ্য ঘটনা-কাহিনী জানতে পারি। মাওলানা আব্দুল করীম দেওবন্দী দিল্লীর পতনের দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করেছিলেন। তিনি ঐ সব ঘটনা আমাকে শুনিয়ে ছিলেন। অপর দিকে ছোটবেলা থেকেই নিজ পরিবারের বৃদ্ধামহিলাদের মুখে পাঞ্জাব বিপ্লবের (১৮৪৬-১৮৪৯খৃ:) বেদনাদায়ক ঘটনাসমূহ শুনে আমার রাজনৈতিক চিন্তা - চেতনা শাণিত হয়ে ওঠে। সতুরাং আগে লাহোরের জন্য যা ভাবতাম, তখন দিল্লীর জন্য তা ভাবতে থাকি"[১]। সিন্ধী তাঁর রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও জিহাদের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন শাহ ইসমাঈল শহীদ লিখিত রচনাসমূহ থেকে একটি প্রবন্ধকে সামনে রেখে। তাঁর সে কর্মসূচী ছিল, ইসলামী ইনকিলাব ভিত্তিক। আর শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর (র.) "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা " পড়ুয়া ও সে দর্শন অনুসারীদের নিয়ে নিজের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী জিহাদের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জিহাদী কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল, মাতৃভূমি ভারতকে বৃটিশের কবল থেকে মুক্তকরা [২]। সিন্ধী

১-২. [১]আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০৬; "নকশ্-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

দেওবন্দ মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে তাঁর উস্তাদ শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসানের বৈপ্লবিক চেতনাদ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং বৃটিশ খেদাও আন্দোলনের কর্মসূচীতে জড়িয়ে পড়েন। দেওবন্দের জমী'অতুল আনসার ছিল প্রকারান্তে একটি রাজনৈতিক সংগঠন। সিন্ধী এর সেক্রেটারী পদ গ্রহণ করে সরাসরি রাজনীতির মাঠে নামেন এবং শায়খুল হিন্দের আদেশ পালনে ব্রতী হন[১]।

জমী'অতুল আনসারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, বৃটিশ রাজ উৎখাতের জন্য পরিকল্পনা মুতাবিক যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করা। সে উদ্দেশ্যে মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলা হয়। সিন্ধী দেওবন্দের ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ নিয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁর দ্বিমত হলে তিনি দেওবন্দ ত্যাগ করেন। দেওবন্দের 'আলিম ও এর অনুসারীগণ সূচনা থেকেই ইসলামী ঐক্য ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন । তারা ভারতে বৃটিশ শাসনকে কখনো মেনে নিতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তারা দেওবন্দ থেকে প্রকাশ্যে যুদ্ধাভিযানের পক্ষপাতি ছিলেন না। এ দ্বিমত পর তিনি শায়খুল হিন্দের নির্দেশে প্রথমে দিল্লী অতঃপর বৃটিশ রাজ উৎখাত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন উদ্দেশ্যে কাবুল গমন করেন[২]। কাবুলে যেয়ে আফগান সরকারকে বৃটিশের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে জার্মান -তুর্কী মিশনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও মৌলবী বরকত উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত অস্থায়ী ভারত সরকারের স্বদেশমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে আফগান সরকারের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দকে বৃটিশ বিরোধী করে তুলতে সক্ষম হন[৩]। আফগানিস্তানের অধিবাসীরা হলেন জন্মগতভাবে ধর্মভীরু ও যোদ্ধা । তুর্কী খিলাফতের প্রতি ছিল তাদের স্বভাবতই অগাধ শ্রদ্ধা । তাই খলীফার দেশ তুরস্ক আক্রান্ত হলে তারা ভীষণ মর্মাহত হন। উল্লেখ্য, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার বছর। ইউরোপীয় খৃস্টান শক্তিবর্গ তুরস্কের উসমানী সাম্রাজ্য ধ্বংস করে উহা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করার এক গোপন চুক্তি করেছিল। ১৯১২খৃঃ প্রথম বলকান যুদ্ধ , ১৯১৩ খৃঃ দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ এবং ১৯১৪-১৯১৮খৃঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সেই গোপন চুক্তিরই সুদূর প্রসারী চক্রান্ত[৪]। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে। কিন্তু বৃটিশ জোটবদ্ধ মিত্রশক্তি দ্বারা খলীফার দেশ তুরস্ক আক্রান্ত হলে মুসলিম বিশ্ব মর্মাহত হয়। আফগান আমীর হাবীবুল্লাহ খান তখন বৃটিশের পক্ষ অবলম্বন করায় অধিকাংশ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং দেশবাসী ছিলেন

---

১. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১।

২. আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৭।

৩. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪-২৩৫ ; "নকশ্-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃঃ ১৮০।

৪. আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

তার প্রতি অসন্তুষ্ট। তাই দেখা গেল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর কাবুলে উপনীত তুর্কী-জার্মান মিশন ও মাওলানা সিন্ধীর ভারতীয় মুজাহিদগণ আফগান জনগণকে বৃটিশ বিরোধী জিহাদের জন্য চাঙ্গা করতে সক্ষম হন। মাওলানা সিন্ধী তখন শায়খুল হিন্দের পূর্ব পরিকল্পনা অর্থাৎ আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে তুর্কী বাহিনী ও কাবুলে সমবেত ভারতীয় মুজাহিদগণের বৃটিশ ভারতে আক্রমণ এবং ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ; ঘটানোর পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করতে আফগান সরকারের সমর্থন আদায়ের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু কাবুল শাসনকর্তা আমীর হাবীবুল্লাহর বৃটিশ প্রীতি ও গুপ্তচর বৃত্তির কারণে সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ফলে বৃটিশ সরকারের ইঙ্গিতে এবং কাবুল সরকারের আদেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অপরাধে ভারতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে সিন্ধী গ্রেফতার হন এবং এক বছর আট মাস কারাবরণ করেন। এরই মধ্যে আফগানিস্তানে একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। আমীর হাবীবুল্লাহ জালালাবাদে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। ক্ষমতায় আসেন আমীর আমান উল্লাহ খান। তার শাসনামলে সিন্ধী মুক্তি লাভ করেন । আমান উল্লাহ বৃটিশ ভারতের উপর আক্রমণ করেন। এই তৃতীয় ইঙ্গ–আফগান যুদ্ধে মাওলানা সিন্ধী আমান উল্লাহ খানকে তাঁর জুনূদুল্লাহ (বাহিনী) দিয়ে সাহায্য করেন; বরং আফগান সৈন্যদের সাথে তাঁরা কাঁদে কাঁদ মিলিয়ে যুদ্ধ করেন এবং আফগানিস্তানের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনেন । সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর বৃটেনের সাথে আমীর আমান উল্লাহর সন্ধি হয়। বৃটিশ সরকার আমান উল্লাহকে আফগানিস্তানের সার্বভৌম বাদশা বলে মেনে নেয়। আফগানিস্তান এবার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়ে সার্বভৌম মর্যাদার অধিকারী হয়[১]। যুদ্ধে সিন্ধীর ভূমিকার জন্য আমীর আমান উল্লাহ তাঁর প্রতি প্রীত হন। মাওলানা সিন্ধী তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে কাবুল সরকারের বিরাট উপকার করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর মিশনটি ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয় নিজেদের কারণে ।

সিন্ধীর রাজনৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য ছিল, স্রেফ 'ইলাউ কালিমাতিল্লাহ, দ্বীনে হকের স্বাতন্ত্রতা রক্ষা ও উচ্চ মার্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা । সে উদ্দেশ্যে তিনি ভারত ত্যাগ করে কাবুল গমন করেছিলেন । কিন্তু কাবুলে অবস্থান করেই তিনি যখন দেখলেন, এই দুর্গের পতন হয়েছে, তখন ভাবলেন, এখানে থাকা যুক্তি, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিপন্থী। তাই নতুন আর একটি দুর্গ খুঁজতে হবে, যার উপর দাঁড়িয়ে ইসলামের বৈরীশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়[২]। সে দুর্গটির ধরণ ও এর নির্মাণশৈলী কেমন হতে হবে; তা জানতে হলে ইসলামের বিরোধী শক্তিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ইসলাম বিরোধী শক্তির মধ্যে এমনকি যাদুকরি প্রভাব রয়েছে, যার মাধ্যমে সে সারা দুনিয়াতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, আর তার বিপরীতে মুসলমানগণ

---

১. নূর উদ-দীন আহমদ, (অনূ), প্রাগুক্ত, পৃ: ৭।

২. সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ:৩৫- ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

গরীব ও নিঃস্ব হচ্ছে । তাই তিনি এসব বিষয় জেনে ও স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করে একটি নতুন চিন্তাশক্তি ও দর্শনের আবিস্কার করতে চেয়েছিলেন, যার মাধ্যমে পরবর্তীতে ভারতকে গড়া যায়। সে উদ্দেশ্য তিনি আফগানিস্তান ত্যাগ করে মস্কোয় পৌছেন । অতপর তুরস্কে এবং অপরাপর ইউরোপীয় দেশে কিছু দিন অবস্থান করেন[১]।

আফগানিস্তানে তাঁর বিপ্লব পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার পর তিনি যে বিষয়টি উপলব্ধি করেন তা হল ঃ বৃটিশের ন্যায় বিরাট শক্তির সাথে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হতে হলে চাই নিজেদের ব্যাপক প্রস্তুতি । দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তি দিয়েই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হবে। বৈদেশিক শক্তির সাহায্যের উপর ভরসা করা যাবে না; বরং বিদেশী শক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা নিরর্থক। স্বাধীনতা আন্দোলন নিজ বাহুবলেই করতে হবে এবং এর জন্য ছোট ছোট যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে বরং বৃহত্তর অভিযানের প্রস্তুতি নিতে হবে। সিন্ধী যখন দেশ ত্যাগ করেছিলেন তখন তাঁর নিজের ও সাথীদের মনে এ দৃঢ় আশাবাদ ছিল, যে কোন মূল্যে উসমানীয় খিলাফত টিকিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু তিনি কাবুল পৌছে দেখেন, প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব অনেক সমস্যা রয়েছে; সে গুলোর সমধান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দিতে হয়[২]। কাবুলে দীর্ঘ সাত বছর অবস্থান করার ফলে তাঁর মধ্যে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হয়েছিল যে, শায়খুল হিন্দ যে প্যান ইসলামীজম-এর ভিতের উপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ইসলামী বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তা এখন অবাস্তব স্বপ্নে পরিণত হয়েছে এবং যাদের উপর তিনি ভারতের মুসলমানদের দুঃসময়ে সাহায্য করবে বলে ভরসা করেছিলেন, তারা নিজেরাই এখন দুর্দশাগ্রস্থ ও ক্ষতবিক্ষত । তুরস্কের ইসলামী খিলাফত প্রথা রহিত হবার পূর্বেই তাঁর মধ্যে এ ধারণার জন্ম হয়েছিল[৩]। তাই তিনি বলেন, "ভারতবাসীর উচিত বর্হিদেশের কোন বিব্রতকর সাহায্য কর্মসূচীর সাথে জড়িত না হওয়া; বরং তাদের কর্তব্য হবে, নিজ দেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া । এজন্য একশ' বছর সময় লাগলেও এ কর্মসূচী পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই"[৪]। তবেও দৃঢ় চেতনা সম্পন্ন ও সৎসাহসের অধিকারী মাওলানা সিন্ধীকে কখনো নৈরাশ্য স্পর্শ করতে পারেনি। তুরস্কে উসমানীয় খিলাফতের পতন তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি । আবার শুধু আত্মপ্রবঞ্চনার মাধ্যমে বেঁচে থাকার পক্ষপাতিও তিনি ছিলেন না; বরং তিনি নতুন চিন্তা-চেতনায় উদ্বেলিত হন। দুনিয়াকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন[৫] ।

---

১. সাঈদ আহমদ,আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ:৩৫- ৩৭।

২. নূর উদ-দীন আহমদ, (অনূ), প্রাগুক্ত, পৃ: ৫-৬।

৩. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২-৩৩।

৪. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৩।

৫. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন বিশ্বরাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, আমীর আমান উল্লাহ ১৯১৯খৃঃ হতে ১৯২৯ খৃঃ পর্যন্ত দশ বছর কাবুল শাসন করেন। এসময় তিনি আফগানকে ইউরোপের ধাঁচে আধুনিকায়ন করেন। কাবুল অবস্থানকালে সিদ্ধী আমীর আমান উল্লাহর সংস্কার অভিযানে মুগ্ধ হন। ১৯১৭খৃঃ লেনিন (১৮১৭-১৯২৪ খৃঃ) রাশিয়ায় সমাজবাদের ভিত্তি রচনা করেন। সিদ্ধী তুরস্কের পথে রাশিয়ায় গমন করে সেখানকার সমাজবাদে প্রভাবিত হন এবং রাশিয়ার অনুসরণে কৃষক, শ্রমিকও মজুরদের প্রতিনিধিত্বমূলক পুঁজিবাদের জুলুমমুক্ত একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন । সিদ্ধী বলেন, " শ্রমজীবীদের প্রতি অত্যধিক কর্তব্যবোধ ব্যতীত সমাজ জীবনের ভারসাম্য সৃষ্টি হতে পারেনা " শাহ ওয়ালী উল্লাহর এ উক্তির তাৎপর্য আমি ততক্ষণ পর্যন্ত অনুধাবন করতে পারিনি, যতদিন না ইউরোপে গিয়ে সোশ্যালিজম সম্পর্কে গবেষণা করেছি। যারা আমাকে এ বিষয়ে বুঝতে সাহায্য করেছিলেন, তারা ছিলেন মার্কসপন্থী "[১]।

১৯২৪ খৃঃ ৩ মার্চ কামাল পাশা তুরস্কে খিলাফতপ্রথা রহিত করে কামালপন্থী সরকারী আইন রচনা করেন। দেশজয়ের পরই তিনি ইউরোপীয় ধাঁচে সমাজের সংস্কার সাধন করেন। তাঁর মত ও আদর্শ অনুযায়ী নব্যতুরস্ক গঠন করেন । শরয়ী কানূনের পরিবর্তে সুইজারল্যান্ডের অনুকরণে আইন জারী করেন। তুর্কী টুপি ধারণ নিষিদ্ধ করেন । ওয়াকফ্ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। মাদ্রাসাসমূহ আইন করে বন্ধ করে দেন। আরবী বর্ণমালা উচ্ছেদ করে ল্যাটিন বর্ণমালা জোর করে প্রবর্তন করেন । এক কথায় ইসলামী সভ্যতা - সংস্কৃতি উচ্ছেদ করে সম্পূর্ণ নতুন তুরস্ক গঠন করেন[২]। সিদ্ধী ১৯২৩ খৃঃ মস্কো থেকে তুরস্কে গমন করে সেখানে কামাল পাশার আধুনিক তুরস্ক প্রত্যক্ষ করেন। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর কামাল পাশার বিপ্লব, সমাজসংস্কার স্বচক্ষে দর্শন করে এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। তাঁর রাজনৈতিক চেতনায় পরিবর্তন হয়। তিনি ইসলামী ঐক্য (প্যান ইসলামাবাদ) চিন্তা ত্যাগ করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে রাজনীতির মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। প্যান ইসলামাবাদ চিন্তা ত্যাগ করা সর্ম্পকে তিনি বলেন, "আমি তিন বছর তুরস্কে ছিলাম । সেখানে আমি প্যান ইসলামাবাদের ইতিহাস অধ্যয়ন করে অনুমান করলাম, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বে এর কোন কেন্দ্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। শায়খুল হিন্দের বিপ্লবকে কিভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে, তা ইউরোপ থেকে শিখতে হবে। তাই তুরস্কের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমার ইসলামী আন্দোলনকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধীন নিয়ে আসাকে জরুরী মনে করি। আর এর অধীন নিজস্ব চিন্তাধারা অনুযায়ী একটি পার্টির (সর্ব রাজ্য পার্টি) গঠনতন্ত্র ও উদ্দেশ্য ছেপে দিলাম"[৩]।

---

১. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯; নূর-উদ-দীন আহমদ (অনূ), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭-৮।

২. নূর উদ-দীন আহমদ (অনূ), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮; আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৭-৪০৮।

৩. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০; আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৪ খৃঃ তুরস্কের ইস্তাম্বুল থেকে উর্দূভাষায় প্রকাশিত সিন্ধীর সর্বরাজ্য পার্টির মেনিফেস্টো প্রকাশিত হয়। ঐ মেনিফেস্টোর সারমর্ম হল ঃ

১. ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা হবে এবং স্বাধীন ভারতে ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২. ভারতের মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ এবং ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করা হবে।

৩. জমিদার ও পুঁজিবাদ খতম করা হবে।

৪. ভারত হবে বহুজাতীয় আবাস ভূমি ।

৫. অভিন্ন ভাষাভাষি ও অভিন্ন তাহযীব- তমদ্দুনের অধিকারী অঞ্চলগুলোকে পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে।

৬. প্রতিটি রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে।

৭. কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু সামরিক, বৈদেশিক বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রনীতি বিভাগ [১]।

সর্বরাজ্য পার্টি

সদস্য পদ : সর্বরাজ্য পার্টির সদস্যদের জীবন পদ্ধতির মান দেশের কৃষকদের চেয়ে উন্নত করার চেষ্টা হবেনা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিঃ সর্বরাজ্য পার্টির মতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। অভিন্ন ভাষা, অভিন্ন আচার– অনুষ্ঠান ও অভিন্ন সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভারতকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হবে এবং প্রতিটি প্রদেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। প্রতিটি রাষ্ট্র পররাষ্ট্র নীতি , দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি ছাড়া অন্য সব বিষয়ে স্বাধীন থাকবে। অভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে কয়েকটি প্রদেশ মিলে একটি ফেডারেশন গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকারে প্রবেশ করতে পারবে। এই গণতান্ত্রিক দেশ গুলোতে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষকে ভোটাধিকার দেয়া হবে। সমাজের প্রতিটি শ্রেণী যেমন- কৃষক, মজুর, বুদ্ধিজীবী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী তাদের নিজ নিজ সংখ্যানুপাতে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।

আর্থ-সামাজিক মূলনীতিঃ রাষ্ট্রের যাবতীয় আয়ের উৎস জাতীয় মালিকানাধীন থাকবে । ব্যক্তি মালিকানা সীমিত থাকবে। দেশের ভূমি জাতীয় মালিকানাধীন থাকবে। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করা হবে। সুদী লেন-দেন থাকবেনা । সরকারী কারখানাগুলো মজুরদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। শ্রমিকরা এর মুনাফার অংশ পাবে । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক

---

১. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫২, ৪৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ও অবৈতনিক করা হবে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কোঅপারেটিভ সোসাইটির অধীন দেয় হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার : কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি রাষ্ট্রের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেনা। পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বাণিজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে।

আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক : সাম্রাজ্যবাদের অবসান এবং উপরোল্লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে এশিয়াটিক ফেডারেশন গঠন করা হবে[১]।

১৯২৬ খৃ: মাওলানা সিন্ধী তুরস্ক ত্যাগ করে ইসলামের কেন্দ্রভূমি মক্কায় পৌছেন। সেখানে তখন ইবন্ সউদের রাজত্ব। হেযায সরকারকে প্রথমেই তিনি আশ্বাস দেন যে, তিনি মক্কায় কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ড করবেন না। সেখানে তিনি নিজেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিয়ে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরর্দশিতার পরিচয় দেন। হেযায সরকার সর্ম্পকে তখন ভারতবর্ষের মুসলমানগণ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সিন্ধী তা থেকে নিরপেক্ষ ছিলেন, এ প্রমাণ পেয়ে সৌদী সরকার তাঁকে আশ্রয় প্রদান করেন। ইবন্ সউদ মক্কার শরীফ হুসাইনকে পরাস্ত করে হেযাযের শাসনক্ষমতা হাতে নিলে ভারতবর্ষের আলিমগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। লখনৌর মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গী মহল্লী (১৮৭৮-১৯২৬খৃ:)-এর নেতৃত্বে আলিমগণ শরীফ হুসাইনকে সমর্থন দেন। পক্ষান্তরে মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও তার সমর্থকগণ ইবন্ সউদকে সমর্থন করেন। সিন্ধী ভারতীয় আলিমগণের কোন দলকে সমর্থন না করে; বরং নিরপেক্ষ থেকে স্বীয় কাজকর্ম চালিয়ে গেলেন । তিনি দীর্ঘ বার বছর মক্কায় অবস্থান করে লেখা-পড়া ও গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন এবং সেখানকার ইসলামী হুকূমতের দৃষ্টান্ত খুব কাছে থেকে দেখতে পান। সিন্ধী সেখানে শাহ ওয়ালী উল্লাহর রচনাবলী আগাগোড়া এবং তৎসংক্রান্ত দেওবন্দের আলিমগণের কিতাবসমূহ গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করেন। সাথে সাথে ইসলামের তেরশ' বছরের ইতিহাস গভীরভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ পান। ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য আরব বন্ধুদের কাছ থেকে গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। শিক্ষার্থীদেরকে তিনি বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষা দিতেন [২]। হেযাযে প্রবাসকালে তিনি রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকেন। সেখানে যারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন তারা তাঁকে বই-পুস্তকের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখেছেন। হেযাযের সুদীর্ঘ প্রবাস জীবনে নিজের অতীত জীবন, এবং সে জীবনের সঞ্চয় পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে দেখেছেন। সেখানে বসেই তিনি নিজস্ব চিন্তা - গবেষণার ফলাফল , অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘজীবনের বহু মূল্যবান সঞ্চয় জনসাধারণের গোচরে আনার ও সকলের সামনে বিতরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন[৩]। কিন্তু হেযাযের জনগণ না তাঁর কথা

---

১. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫২-৪৬০।

২-৩. নূর উদ- দীন আহমদ (অনূ), প্রাগুক্ত, পৃ: ৯ ; আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০৮।

Dhaka University Institutional Repository

হৃদয়াংগম করতে পারলো, না তাদের এর কোন প্রয়োজন ছিল। তাঁর চিন্তাধারা দ্বারা স্বদেশবাসীই বেশী উপকৃত হতে পারতেন। কিন্তু তিনি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ পেলেন, তখন তাঁর উপর নানাবিধ শর্তারোপ ও বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। সেগুলো স্বীকার না করে তাঁর দেশে ফেরার কোন সুযোগ ছিলনা। ফলে দীর্ঘ ২৪ বছরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধ স্বদেশবাসীকে উপহার দেয়ার সুযোগ পেলেন না[১]।

সিন্ধী ১৯৩৯ খৃঃ নির্বাসন জীবন কাটিয়ে দেশে ফেরার পর নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা -চেতনার আলোকে কাজকর্ম আরম্ভ করেন । ১৯৩৯ খৃঃ মার্চ মাস থেকে শুরু করে ১৯৪৪ খৃঃ আগষ্ট অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ বছর মাঠে -ঘাটে প্রকাশ্যে রাজনীতি করেন। এ সময়ে তিনি সামরিক শক্তির মাধ্যমে বৃটিশ সরকার উৎখাত পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এবং ইসলামী জিহাদের ব্যাখ্যা দেন এভাবেঃ " জিহাদ অর্থ শুধু প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযান নয়; বরং এর আরো একটি অর্থ আছে। তা হলঃ মুসলিম বাদশাহর অবর্তমানে জিহাদ বলতে বুঝায় সমাজ বিপ্লব। কাবুলে থাকার সময় আমি জিহাদের প্রথম অর্থ (সশস্ত্র সংগ্রাম) কে গ্রহণ করেছিলাম, সেখানে মুসলমান বাদশাহ ও মুসলমান সামরিক শক্তি বজায় থাকার কারণে । এর পর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমি কাবুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছি এবং রাশিয়ায় চলে যাই । সেখানে সোশ্যালিজম অধ্যায়ন করে শায়খুল হিন্দের বাতলানো জিহাদের অর্থের প্রয়োগ বুঝতে পারি। আর তা হল, মুসলমানদের রাজক্ষমতা ও সমরশক্তি না থাকলে তাদের কর্তব্য হবে, নিজেদের চেষ্টায় দল গঠন ও সংগ্রাম করা। যাকে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিভাষায় বলা হয় বিপ্লব[২]।

মাওলানা সিন্ধীর দেওবন্দের রাজনীতি, জমী'অতুল আনসারের কার্যক্রম, সীমান্তের মুজাহিদ বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ন, বৃটিশ শাসন উৎখাত উদ্দেশ্যে কাবুল গমন এবং সেখানে অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা; এসবই ছিল গোপন রাজনৈতিক কর্মকান্ড । তখন তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশের ঘোর দুশমন, মাতৃভূমি ভারতের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা এবং শায়খুল হিন্দের আন্দোলনের একজন বীর সৈনিক । কিন্তু নির্বাসন জীবন শেষে তিনি দেশে ফিরেন একজন দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী সেজে। মূলতঃ মাওলানা সিন্ধী কি ধরনের মুচলেকা (BOND) দিয়ে দেশে ফেরার অনুমতি পেয়েছিলেন, তা আজো ভারতবাসীর কাছে রহস্যের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। তবে তাঁর নির্বাসনোত্তর রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও বক্তৃতা - বিবৃতি দ্বারা অনুমান হয়; তিনি বৃটিশ শাসন উৎখাত আন্দোলন থেকে বিরত থাকবেন বলে মুচলেকা দিয়ে ভারতে ফেরার অনুমতি পেয়েছিলেন। তাই দেখা যায়, ইতিপূর্বে তিনি বৃটিশের উপর শক্তি প্রয়োগ ও শসস্ত্র আক্রমণ করে

---

১. নূর উদ- দীন আহমদ (অনূ), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯ ;আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৮।

২. সারওয়ার , মুহাম্মদ, পৃঃ ১৫১-১৫২

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করেছেন, সে উদ্দেশ্যে আন্দোলনের ফুলকি সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং স্বাধীনতা হারানোর মর্মবেদনায় ভোগেছেন। কিন্তু দেশের ফিরে তিনি নীতি-আদর্শ ও দর্শনের আলোকে স্বাধীনতার কথা শোনান এবং প্রকাশ্যে বৃটিশকে সমর্থন দেন। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মাওলানা সিন্ধী যখন দেশে ফিরে আসেন (১৯৩৯ খৃ:) তখন তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থা এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সশস্ত্র সংগ্রামের উপযুক্ত পরিবেশ ছিলনা। এসময়ে ভারতের মুসলমানদের যে দূরাবস্থা ছিল তা হলঃ বিশ্বের প্রায় সব দেশের সাথে তার সম্পর্ক ছিল বিচ্ছিন্ন, দুনিয়াতে তখন এমন কোন দেশ ছিলনা যারা ভারতীয় মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়াবে এবং তাদের ভগ্নহৃদয়ে শান্তনা দেবে [১]। এছাড়া সিন্ধী যৌবনের দীর্ঘ ২৪টি বছর প্রবাসে এমন একটি ভিন্ন সমাজ ও ভিন্ন পরিবেশে কাটিয়েছিলেন; যা একটি মানুষের সাহস-শক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বসিয়ে দেয় এবং তার ভেতরের প্রাণশক্তি নিবিয়ে দেয়। তখন সিন্ধীর পেছনে নিজস্ব কাজেরও বেশ তাড়া ছিল এবং তাঁর বয়সও ফুরিয়ে আসছিল; সুতরাং কোন সশস্ত্র আন্দোলনের দাওয়াত-আহবানে সাড়া দেওয়ার জন্য যে স্থিতিশীলতা প্রয়োজন, সেটা তখন সিন্ধীর মধ্যে ছিলনা । তাছাড়া তার শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার দীক্ষাগুরু এমন একজন মনীষীকে গ্রহণ করেছিলেন, যিনি ছিলেন উলামায়ে দেওবন্দের আকীদার অনুসারী। যিনি সিন্ধীর মৃত্যুর প্রায় ২৪ বছর আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য যে ধরণের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, কৌশল, জনবল, সৈন্যবল ও যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজন ছিল, তিনি এর পুরোপুরি বাহক ছিলেন না। তাই সিন্ধী তাঁর জীবনের শেষে এসে দীক্ষাগুরুর সশস্ত্র সংগ্রামের ফরমায়েশ পুরোপুরি আদায় করতে পারেননি[২]। কিন্তু তার পরও সিন্ধী রাজনীতি ত্যাগ করেননি। তিনি সিন্ধুতে কংগ্রেসের আওতায় "যমুনা নর্দমা সিন্ধ সাগর পার্টি" নামে একটি দল গঠন করে (ডিসেম্বর ১৯৩৯খৃ:) এর কাজ চালিয়ে গেছেন।

দেশে ফিরে সিন্ধী ৩ জুন ১৯৩৯ খৃ: কলিকাতায় অনুষ্ঠিত "জমী'অতে উলামায়ে হিন্দ" বাংলা প্রদেশের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বলেন, "দেশের আলিম ও নেতৃবৃন্দের উচিত বৃটিশ সরকারের দু'শ' বছরের শাসন ব্যবস্থা থেকে যথাসাধ্য ফায়দা গ্রহণ করা। ইউরোপের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিহার করা[৩]।

মুসলিমলীগ ছিল এক গোঁড়া মৌলবাদী সংগঠন। এদলটি কিছুতেই ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন মেনে নিতে পারেনি। পক্ষান্তরে কংগ্রেস ছিল বৃটিশের প্রতি নমনীয় । কিন্তু মাওলানা সিন্ধী ৭ মার্চ

---

১. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯-৫০।

২. ঐ, পৃ: ২০।

৩. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৯ খৃঃ দেশে ফিরে করাচী বন্দরেই মুসলিমলীগ প্রত্যাখান করেন এবং কংগ্রেসকে সমর্থন দেন। তিনি বলেন, "কংগ্রেস আমার স্বর্গ, আমি কখনো এর বাইরে যাবনা" [১]। শায়খুল হিন্দও হেযাযে অবস্থানকালে অনুভব করেছিলেন, বিদেশী শক্তির সাহায্যের আশা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে । আর স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের কঠিন কর্মসূচী বাদদিয়ে বরং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করতে হবে। তাই তিনি তিন বছর সাত মাস জেল কাটার পর মাল্টা থেকে ভারতে ফিরে এসে (জুন ১৯২০খৃঃ) কংগ্রেসের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে দেশের আযাদীর জন্য কাজ করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জমী'অতে উলামায়ে হিন্দ, খেলাফত কমিটি ও কংগ্রেসের প্লাটফর্মে থেকে দেশের মুক্তির জন্য কাজ করে যান [২]।

১২ জুলাই ১৯৪০ খৃঃ মাওলানা সিন্ধী সিন্ধু প্রদেশের থাট্টা জেলা কংগ্রেস কমিটির কনফারেন্সে লিখিত উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, "ইংরেজদের শতাব্দীকালের শাসনামলে ভারতবাসী গণতন্ত্র শিক্ষা করেছে, তাদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ তরুণদেরকে গণতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে, ভারতের রাজা-বাদশাহ ও নওয়াবদের শাসন এখন পার্লামেন্টের অধীন চলছে, এদেশ মিশনারীর সাথে পরিচয় লাভ করেছে; সুতরাং বৃটিশ সরকারের প্রতি এ দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত"[৩]। সে অধিবেশনে তিনি বিনাশর্তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্য করার কথা বলেন এবং তাঁর কাবুল গমন ও বৃটিশ শাসন উৎখাতের পূর্বপরিকল্পনার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, " তখন ধর্মীয় কর্তব্যের খাতিরে কাজ করেছি। সে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছি। এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। বৃটিশের সাথে এখন মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ নেই। তাই বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বৃটিশের বিরোধীতা করা ভুল হবে[৪]"। তিনি আরো বলেন, "বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর অধীনে থেকে অহিংস নীতি অবলম্বন করার মাধ্যমে যতটা উন্নতি করা সম্ভব হবে তা অন্যভাবে সম্ভব হবেনা"[৫]। ঐ অধিবেশনে তিনি "জমী'অতে উলামায়ে আহরার" - এর সদস্যগণের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, "যুদ্ধের সময় (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন বন্ধ করা উচিত"[৬]। মোটকথা এক সময়ের বৃটিশ শাসন উৎখাত পরিকল্পনার এই তেজস্বী নেতা দেশে ফিরে বৃটিশ শাসনের প্রশংসা করেন নির্দ্বিধায়। বৃটিশ প্রবর্তিত গণতন্ত্র, সরকারী কাঠামো, তাদের স্থাপিত কলকারখানা , রেল যোগাযোগ ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রশংসা করেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন। তিনি একদিকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলতেন , অপর দিকে বলতেন, বৃটিশ সরকারের সাথে তাঁর কোন দ্বন্দ্ব নেই। তিনি ভারতবাসীকে আরো কিছুকাল বৃটিশের অধীন থাকতে

---

১. "দৈনিক আজাদ", কলকাতা, ২৪ফালগুন ১৩৪৫/৮মার্চ ১৯৩৯খৃঃ সংখ্যা ।

২. "দৈনিক জমী'অত", দিল্লী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫।

৩. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০, ১১৮।

৪-৬. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০, ১১৮,১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

বলেন[১]। সিন্ধী মূলতঃ এসব কথা তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকেই বলতেন। তিনি কাবুলে আমীর হাবীবুল্লাহ খানের পরিণতি প্রত্যক্ষ করেছেন, তুরস্কের সুলতান আব্দুল হামীদ জিল্লুল্লাহর পরিণতি দেখেছেন, রাশিয়ায় জারের পতন দেখেছেন । এসব দেখে-শুনেই তিনি দেশবাসীকে শোষণ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের আহবান জানিয়ে ছিলেন। তবে তাঁর সে আহবানে সাড়া দেয়ার মত আগ্রহ অনেকেরই ছিলনা; বরং তিনি বিদ্রূপের সম্মুখীন হন । তারপরও দেশ ও জাতির সামনে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন[২]। ভারতবর্ষের আলিম সমাজকে আধুনিকতা বরণ করার আহবান জানান এবং তাঁর চিন্তা-চেতনা পরবর্তী পজন্মের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

491330

মুসলিমলীগ ১৯৪০ খৃঃ ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাবে "সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র " প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু সিন্ধী তা সমর্থন করেননি। যেহেতু তখন ভারতবর্ষের মুসলমানদের পাশে সামরিক সাহায্য নিয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের দুঃখ - কষ্টে শরীক হবে এমন কোন দেশ ছিলনা; তাই দেশের মুক্তির জন্য কিছু করতে হলে হিন্দু-মুসলিমের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই করতে হবে; সে অনুভূতি তাঁর মধ্যে কাজ করেছিল। ইসলামের প্রতি হিন্দুদের যে বিদ্বেষভাব রয়েছে তা দূর করতে তিনি "পাকিস্তান আন্দোলন" সমর্থন করেননি; বরং প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন[৩]। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষপাতি ছিলেন। ভারতবর্ষে অভিন্নভাষা ও অভিন্ন তাহযীব-তমদ্দুনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহ গঠন করে সে গুলোকে একটি সরকারের আওতাধীন রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। এতে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্ধ দূর হবে ও আঞ্চলিকতার প্রবণতা হ্রাস পাবে বলে মনে করেছিলেন[৪] এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদমুক্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্লাটফর্মের মাধ্যমে এ দু'টি জাতির মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেন । যেহেতু উভয় জাতির কাছে দেশ ও মাতৃভূমির দাবী এক ও অভিন্ন ; সুতরাং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন হবে একটি । সে সংগঠনের উপর কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রভাব থাকবেনা। দেশের স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠা ও আমদানী-রপ্তানী ইত্যাদি ক্ষেত্রে উভয় জাতি সমানভাবে কাজ করবে[৫]।

সিন্ধী কংগ্রেস সমর্থক হলেও নিয়মিত এর সদস্য ছিলেন না; বরং কখনো কখনো কংগ্রেসের সমালোচনা করতেও দ্বিধা করেননি । তিনি গান্ধীজির কংগ্রেসকে পছন্দ করতেন না। কারণ, মাওলানা সিন্ধী ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারী, আর গান্ধী ছিলেন হিন্দু

---

১. ঐ, পৃঃ ১৬৩।

২. নূর উদ-দীন আহমদ (অনূ), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০-১১।

৩. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯-৫০।

৪. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১।

৫. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭-৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারী । তাঁর অভিযোগ ছিল , গান্ধী কংগ্রেসের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করেছেন। সিন্ধী গান্ধীর কংগ্রেসকে পছন্দ করতেন না বিধায় কংগ্রেসের অধীন " যমুনা নর্দমা সিন্ধ সাগর পার্টি " প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কংগ্রেসকে সংশোধন করে তাতে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে কংগ্রেসে নেয়ার কথা ভেবেছিলেন। গান্ধীর তাবেদারীর কারণে তিনি মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীকে পছন্দ করেননি; বরং মাওলানা মাদানী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সমলোচনা করেন[১]।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অপর একটি বিষয়ের দ্বন্ধও মাওলানা সিন্ধী অনুভব করেছিলেন, তা হলঃ 'আলিমগণ এ বিষয়টি মেনে নিতে পারছিলেন না যে, সাধারণ জনগণের নেতৃত্বর মধ্যে তাদের হাতছাড়া হোক। অপর দিকে আধুনিক শিক্ষিতরা চাচ্ছিলেন, 'আলিমদের নেতৃত্বে কাজ না করা। কিন্তু মাওলানা সিন্ধী চাচ্ছিলেন, 'আলিমগণ যেন তাদের নেতৃত্বে সাধারণ শিক্ষিতদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করেন এবং তাদের কাজকর্মকে অবমূল্যায়ন না করেন। শায়খুল হিন্দ বিষয়টি পূর্বেই অনুভব করেছিলেন বিধায় সেভাবেই কাজ করে গেছেন[২] ।

১৯৪২ খৃ: ৮ আগষ্ট কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে বৃটিশ শাসন উৎখাত কল্পে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হয়। সিন্ধী সে প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন এবং বৃটিশ উপনিবেশে বৃটিশ জাতির সাথে সহাবস্থানের কথা বলেন। বৃটিশের অধীন আরো দশ/ বিশ বছর জীবন কাটানোর কথা বলেন [৩]।

সিন্ধী তুরস্ক থেকে তাঁর সর্বরাজ্য পার্টির যে মেনিফেষ্টো প্রকাশ করেছিলেন তাতে বলেছিলেন, "সমাজে জমিদার থাকবেনা;বরং ভূমি থাকবে সরকারের মালিকানায়"। অথচ দেশে ফিরে তিনি বলেন, জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে কোন সংঘাত থাকবেনা। কৃষকরা জমিদারদের প্রাপ্য অংশ পূর্ণভাবে বুঝিয়ে দেবে এবং জমিদাররাও কৃষকদের স্বার্থের প্রতি খেয়াল রাখবে[৪]। এসব বক্তব দ্বারা অনুমান হয় সিন্ধী এমন কিছু শর্ত মেনে নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন, যে গুলোর কারণে তিনি পূর্বের রাজনৈতিক চিন্তা - পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর পরিবর্তন করেছিলেন।

একথাও সত্য যে, সিন্ধী দেশের স্বাধীনতা হারানোর মর্মবেদনায় ভোগতেন । তাঁর কোন কোন কথা, কর্ম ও বাক্য দ্বারা বিষয়টি অনুমান হয়। সিন্ধী সাধরণত মাথায় টুপি রাখতেন না। মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী একদিন দিল্লীর জামে মসজিদের দক্ষিণ দরজার নীচে দাঁড়িয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে, সিন্ধী সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর লাল কিল্লার দিকে ইশারা করে দুঃখ ও

---

১. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫২।

২. "নকশ্– এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৫৫।

৩-৪. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৬-১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

আফসোসের সাথে বলেন, "আমার মাথার টুপিতো ঐ দিনই নেমে গেছে, যেদিন এ লাল কিল্লা আমাদের হস্তচ্যুত হয়েছে। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত এ লাল কিল্লা আমাদের হাতে ফিরে না আসবে, ততদিন পর্যন্ত আমার আত্মসম্মানবোধ আমাকে মাথায় টুপি পরতে অনুমতি দেয় না"। তিনি আরো বলেন, "যখন থেকে দিল্লীর উপর বৃটিশের কব্জা হয়েছে, তখন থেকেই আমাদের দেশের নূরানী চেহারার উপর দাসত্বের কালিমা লেপন করা হয়েছে"[১]।

সিন্ধীর রাজনৈতিক কলাকৌশল ও চিন্তাধারা সর্ম্পকে পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন, "ইতালীতে কিয়ৎকালের জন্য আমার মৌলবী ওবেইদুল্লাহর সহিত দেখা ইহয়াছিল। তিনি চালাক-চতুর এবং প্রাচীনধরণের রাজনৈতিক কলাকৌশলের সুপটুঃ কিন্তু আধুনিক ভাবধারার সহিত তাহার কোন পরিচয় নাই । তিনি আমাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের (ইউনাইটেড রিপাব্লিকস্ অব ইন্ডিয়া) একটা পরিকল্পনা দেখাইয়া বলিলেন, ইহা দ্বারাই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব । তিনি আমাকে ইস্তাম্বুলে (কনষ্টান্টিনোপল) তাঁহার অতীত কার্যকলাপের কথা বলিলেন । আমার নিকট সেগুলি খুব গুরতর বলিয়া মনে হয়নাই এবং সেগুলি আমি অল্পকাল পরেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম । কয়েকমাস পরেই লালাজির সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছিল এবং তাঁহার নিকটও তিনি এসব গল্প করেন। লালাজী তাঁহার কথায় অত্যন্ত মুগ্ধ হন। সেই সকল গল্পই নানা অযৌক্তিক ও আশ্চর্যরূপে পল্লবিত হইয়া সেই বৎসরের ভারতীয় আইন সভার নির্বাচনে ব্যবহৃত হইয়াছিল । পরে মৌলবী ওবেইদুল্লা হেজাজে যান। তাহার পর আর কয়েক বৎসর আমি তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই"[২]।

এস, পি, সেন সম্পাদিত ডিকশন্যারী অব্ ন্যাশনাল বায়োগ্র্যাফিতে বলা হয়েছে, "তিনি (সিন্ধী) মুসলিম উলামা এবং জাতীয়তাবাদীদের সাথে সর্ম্পক স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। দু'একটি অনুষ্ঠান ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের নিকট থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন" [৩]। নরেশ কুমার জৈন সম্পদতি " মুসলিমস্ ইন ইন্ডিয়া " গ্রন্থে বলা হয়েছে, "তিনি ছিলেন রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন [৪]। মুঈন শাকির সিন্ধীর রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন ও

---

১. আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১১।

২. জওহর লাল নেহেরু, : "আত্মচরিত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অনুদিত, প্রকাশক: অশোক কুমার সরকার, কলিকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ পৃ: ১২২

৩. S.P. Sen (ed), Dictionary of national biography, Voll III, Institute of Historical studies, calcatta, 1974, P. 278

৪. Naresh Kumar, Jain (ed), Muslims in India A Biographical Dictionary. Voll II, Delhi , 1979, P, 189.

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করে বলেন, "উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ছিলেন মাহমূদ হাসান দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত । তিনি একটি রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একদিকে ওয়াহাবীদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন অপর দিকে মাহমূদ হাসানের ইন্দো- মুসলিম যুক্তফ্রন্টের চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় মুসলমান যিনি "ভারতীয় জাতীয়তাবাদ" রাজনীতির প্রবর্তন করেন। সিন্ধী শুধু ইসলামী জাতীয়তাবাদই নয় বরং সেই সাথে মানবতাবাদীও ছিলেন। তাঁর এ ঐতিহাসিক রাজনৈতিক চিন্তার প্রেক্ষাপট ছিল শাহ ওয়ালী উল্লাহর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ফলশ্রুতি । সিন্ধীর জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং গোঁড়াপন্থী আলিমদের চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন। সিন্ধীর মতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারই ভারতীয় রাজনীতির প্রকৃত সমাধান । সিন্ধী ছিলেন প্রগতিশীল ভারত রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা। শাহ ওয়ালী উল্লাহ এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খানের পর তিনিই যুগের চাহিদা অনুযায়ী একটি ইসলামী চিন্তাধারার রাজনীতি প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁর ইসলামী দর্শনের ভিত্তিতে জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন । তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমর্থক । কিন্তু সিন্ধীর এসব রাজনৈতিক পরিকল্পনা শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনে ছিল এক প্রকার অবাস্তব বিষয় । তিনি ছিলেন কৌতূহলী দৃষ্টি সম্পন্ন একজন অবহেলিত ইসলামী চিন্তাবিদ। তারপরও তাঁর ধর্মীয় দর্শন, চিন্তাধারা, চেতনা, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ও চেতনা এবং ইসলামী সমাজতান্ত্রিক চেতনা ভারতীয় মুসলিম রাজনৈতকি চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এক বিশেষ অবদান [১]।

অর্থনৈতিক বিষয়ে মাওলানা সিন্ধী কামনা করেছিলেন, রাশিয়ার সমাজবাদ ভারতে প্রতিষ্ঠিত করতে। তবে তাঁর সমাজবাদচিন্তা ইউরোপের ন্যায় ধর্ম বিবর্জিত ছিলনা বরং ধর্মের মূলনীতি ঠিক রেখে তিনি সমাজ বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে ইসলামের বৈপ্লবিক শক্তি এবং ইসলামিক জীবনবোধ রাশিয়ার সমাজবাদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। তাঁর চিন্তাধারা মতে পুঁজিবাদ সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী। পবিত্র কুরআনে পুঁজিবাদের কোন স্থান নেই। সিন্ধীর সমাজ বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল, অর্থনৈতিক মুক্তি। আর অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিনি ভারতে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। সেই বিপ্লবের সন্ধান তিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনে পেয়েছেন বলে দাবী করেন। তিনি কৃষক, মজুর ও খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। তাদের জীবনমান ইউরোপীয় কৃষক শ্রমিকদের ন্যায় করতে চেয়েছিলেন [২]। মূলত সিন্ধীর মানসলোকে ইসলামের যে নমুনা ছিল, তা ভারতবর্ষে বা কাবুলে স্বৈরাচারী ও আর্দশচ্যুত বাদশাহগণের মধ্যে দেখতে পাননি। তাই আদর্শচ্যুত ইসলামী সমাজব্যবস্থাকে সমর্থন না জানিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং

---

১. Moin Shakir, Khilafat ot partition, Dehli, 1983, P, 43-46.

২. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০২।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর শুরুরদিকে বিশ্বে যে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল এবং বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল ; সেই ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের কথা বলেন [১]। তিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনের আলোকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো সমাধান দেয়ার চিন্তা করেছিলেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনকে একটি বিশ্ব শক্তিতে পরিণত করার ও চিন্তা করেছিলেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সিন্ধী এসব বিষয়ে সফল হয়েছেন যৎসামান্য । কারণ, তিনি চিন্তাজগতে যতটা অগ্রগামী ছিলেন কর্মে ততটা উর্দ্ধমুখী ছিলেননা। তিনি শিল্প বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু এর পথনির্দেশ দিতে পারেননি এবং শিল্প বিপ্লবের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবস্থা করতে পারেননি। তিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শন শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন বটে,কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেননি। তাঁর সম্পর্ক ছিল মাদ্রাসা শিক্ষিতদের সাথে । তিনি মাদ্রাসা সংস্কারের দিকে মনোযোগী ছিলেন বটে কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির প্রতি দৃষ্টি দেননি। জীবনের শেষ পাঁচ বছর তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, সভা-সমিতিতে যোগ দিয়েছেন, ভাষণ দিয়েছেন, "বায়তুল হিকমত সিন্ধ সাগর একাডেমী" ও "শাহ ওয়ালী উল্লাহ আবুল কাসিম থিয়লজিক্যাল কলেজ" প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং " সর্বরাজ্য পার্টি"র দ্বিতীয় সংস্করণ " যমুনা নর্দমা সিন্ধ সাগর পার্টি" নামক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু এসবে সাফল্য লাভ করেন অতি অল্প। তাঁর মিশন ও কর্মকান্ড জনপ্রিয়তা লাভ না করার অপর একটি কারণ সম্পর্কে মাওলানা সাঈদ আহমদ বলেন , "এর দু'টো কারণ রয়েছে । ১. মাওলানা সিন্ধী যতবড় গবেষক, চিন্তাবিদ ও নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন, ততবড় বাগ্মী, সুবক্তা ও সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি গভীর তথ্যমূলক কথা বলতেন বটে,কিন্তু বলার ভংগিতে তা এলোমেলো হয়ে যেত। ফলে শিক্ষিত সমাজ ও বুদ্ধিজীবীগণ তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা করতেন। ২. চিন্তা জগতে যথেষ্ট পরিপক্ক ছিলেন না বিধায় তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না । যে কারণে বলার সময় ভাব-ভংগি কিছুটা এলোমেলো হত এবং রুক্ষ, কর্কশ ও শ্রুতিকটু শোনাত। সিন্ধী নিজেও বিষয়টি স্বীকার করেছেন [২]।

সিন্ধীর জীবনের দিকে তাকালে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তিনি দীর্ঘ ২৪ বছর বিভিন্ন দেশে যাযাবরের মত ঘুরেছিলেন এবং সেখানকার হাল-অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ফলে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসেছিল। তারপরও তাঁর মৌলিখ চিন্তাধারা যা ছিল কুরআন, হাদীস, ধর্মীয় ইমাম ও নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা অনুযায়ী, তা থেকে তিনি বিচ্যুত হননি । তিনি জীবনভর ইসলামের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, ইসলামের জন্য জেল–যুল্‌ম, দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রনা ভোগ করেছিলেন [৩]।

---

২. নূর উদ- দীন আহমদ, (অনূ) প্রাগুক্ত, পৃ: ৮।

৩. 'আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১২।

৪. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৫
ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা মূল্যায়ন করতে এ বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি জন্মগতভাবে মুসলমান ছিলেন না; বরং একটি বিখ্যাত শিখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত হয়েও সব কিছু বির্সজন দিয়ে ইসলামের নির্ভেজাল তাওহীদ ও সত্যতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন [১]। ১৯৪৪ খৃঃ ১৭ এপ্রিল হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত "সিন্ধু আরবী ছাত্র সমিতি'র অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, "আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাওহীদ ও শির্ক্ বিষয়ে নিজ ঘরে লেখা- পড়া করেছিলাম। এতে এ বিষয়টি আমার কাছে পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, ইসলামই একমাত্র সত্যিকার তাওহীদ শিক্ষা দেয়। তাই ইসলাম ধর্মের উপর অন্যান্য ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছিলম[২]"। সিন্ধী আরো বলেন, "হিন্দু ধর্মও এক সময় ইহুদী- খৃষ্ট ধর্মের ন্যায় সত্যধর্ম ছিল। কিন্তু বর্তমানে এতে নানান ধরণের শিরক্ অনুপ্রবেশ করেছে"[৩]। সিন্ধী বলেন, "মানুষের জন্য ইসলামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম ,মতবাদ, দর্শন, সভ্যতা ও আইন দুনিয়াতে নেই। ইসলাম ধর্ম দেশ, জাতি ও যুগের মধ্যে সীমিত নয়"[৪]। ইসলাম প্রগতির ধর্ম, মানবতার ধর্ম। এর মৌলিক বিষয়গুলো অপরিবর্তনীয়। কিন্তু আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহ যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তন হতে পারে।

সিন্ধীর মতে, আসমানী ধর্ম হিসেবে যেমন ইহুদী –খৃষ্ট ধর্মের স্বীকৃতি রয়েছে, তদ্রূপ এর উপর বিশ্বাস করার জন্যও হুকুম দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলাম আগমণের পর মুসলমানদের একটা পরিস্কার ধর্মভিত্তিক বিশ্বাস, শরীয়ত ও স্বাতন্ত্রতা এসেছে। যা চিরকাল তাদেরকে অন্যান্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পবিত্র কুরাআনের ঘোষণামতে, ইসলামই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত ধর্ম[৫]। তাই এখন অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। হিন্দু ধর্মের সত্যতা সর্ম্পকে পবিত্র কুরআন এবং ইসলাম ধর্মের কোথাও উল্লেখ নেই [৬]। সিন্ধীর এ অভিমত দ্বারা বুঝা যায়, তিনি নিরপেক্ষভাবে সচেতন দৃষ্টিতে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে তা গ্রহণ করেছিলেন।

সিন্ধী মনে করতেন, মায়াবাদী মুসলিম সূফীদের "ওয়াহ্দাতুল অজূদ[৭]" হিন্দু বেদান্ত–

---

১. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

২-৩. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৬-১৪৭ "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৫৬-১৫৭।

৪. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৫৬-১৫৭।

৫. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৯ ।

৬. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৪-৯৫।

৭. **'ওয়াহ্দাতুল অজূদ'**ঃ সিন্ধী ইবনুল আরাবীপন্থী মায়াবাদী মুসলিম সূফীগণের ওয়াহ্দাতুল অজূদ-এর ব্যাখ্যায় সিন্ধী বলেন, "ওয়াহ্দাতুল অজূদ" মানে – বিভিন্ন ধর্মের সত্যতা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ লাভ করে। আসল ধর্ম এক, কেবল রূপের তফাত। কিন্তু এটা কি করে বোঝা যাবে, আসল ধর্ম কি? ঐ সত্য কোনটি, যা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ লাভ করে ? ঐ নীতিগুলো কি, যা সকল ধর্মের মধ্যে অভিন্ন? ইবনুল ————

Dhaka University Institutional Repository

বাদেরই[১] সার ও সংশোধিত সংস্করণ । আর হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র.) ঐ দর্শনের পূর্ণতা এনেছেন ও সংস্কার সাধন করেছেন[২]। সিন্ধী এই পথ ধরেই হিন্দু -মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নিজ নিজ ধর্ম বজায় রাখার পর ও ঐক্যবদ্ধ করার চিন্তা করেছিলেন [৩]। "ওয়াহ্দাতুল অজূদ" সূফীবাদী দর্শনের মাধ্যমে ভারতের হিন্দু –মুসলিম অনৈক্য, সাম্প্রদায়িক খুন–খারাপীর অবসান করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেছিলেন ।

সিন্ধী ১৯৩৯ খৃঃ ৩ জুন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক "জমী'অতে উলামায়ে ইসলাম" –এর এক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে "ওয়াহ্দাতুল অজূদ" সর্ম্পকে বলেন, ইসলামী দর্শন হল, মূলতঃ ঐ হিন্দু ধর্ম যা ভারতীয় মুসলিম সাধকগণ দ্বারা পূর্ণতা পেয়েছে। আর ঐ পূর্ণতা দানের শিক্ষক ও মুর্শিদ হলেন শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ। তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" এবং তাঁর দর্শন বিষয়ক রচনা "আল-বুদূরুলবাযিগাহ" ও "আত-তাফহীমাতুল ইলাহিয়্যাহ" ইত্যাদি গ্রন্থে এ বিষয়ে পরিষ্কার ভাষ্য দিয়েছেন[৪]। মুসলিম সূফীবাদ বেদান্তবাদ থেকে উৎসারিত [৫]। তবে মাওলানা সিন্ধীর এ মতবাদ মুসলিম সূফীসাধকগণ সমর্থন করেন না। কারণ, আধ্যাত্মিক সাধনা হল, ইসলামের খাঁটি সাধনা । এর সাথে বেদান্তবাদের কোন যোগসূত্র নেই। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মূলতঃ মুসলিম সম্প্রদায় সমূহের মাঝে পরস্পর বিরোধী ধ্যান–ধারণার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। ইবনুল আরাবী ওয়াহ্দাতুল অজূদ তথা মায়াবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) "ওয়াহ্দাতুশ শুহূদ" (একত্ববাদের সাক্ষ্য) অর্থাৎ দ্বিত্ববাদের সমর্থক ছিলেন । হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) এ দু'টি মতবাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য দিতে যেয়ে বলেন, " প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর সত্ত্বা একক ও অদ্বিতীয় । বিশ্বের সৃষ্টিরাজি তাঁর অংগ নয় বটে, কিন্তু তাঁর একক সত্ত্বার প্রমাণ বহন করে "। কিন্তু শাহ ওয়ালী উল্লাহর এই সামঞ্জস্য বিধানের অর্থ এই নয় যে, তিনি বেদান্তবাদ উদ্ভূত ওয়াহদাতুল অজূদের সংস্কার করেছেন।

আরাবী ও তাঁর অনুসারীদের অভিমতে– ইসলামই ঐ সত্যের মাপকাঠি। ঐ মাপকাঠি দিয়েই সকল ধর্মের সত্যতা বিচার করা যেতে পারে। এই অর্থে "ওয়াহ্দাতুল অজূদ"কে মানলে ইসলামের গায়ে আচঁড় লাগবে না ; বরং এতে ইসলামের যথার্থতাই প্রতিপন্ন হবে। এ জন্যই ইবনুল আরাবী এই চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেছেন"। (সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৭-২৪৮।)

১. **বেদান্তঃ** ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপক শাস্ত্র। বেদের শেষ ভাগ তথা উপনিষদকে বেদান্ত বলে। এতে বেদের সারবস্তু আছে বলে এর নাম বেদান্ত। বেদান্তের ব্রহ্ম সূত্রের রচয়িতা বাদরায়ণ (বেদব্যাস)। অনেকের মতে উপনিষদ বেদজ্ঞগণের নিস্কাশিত সার, তাই তা বেদান্ত। শঙ্করাচার্য (আবিঃ আনু. ৮০০) তাঁর "শারীরক ভাষ্যম' নামক বিখ্যাত বেদান্ত ভাষ্যে তিনি যে মতবাদ প্রকাশ করেন, তা হিন্দু চিন্তাধারায় গভীরভাবে রেখাপাত করে। এই অভিমতে ব্রহ্ম বিশ্বস্রষ্টা এবং একাধারে অতীন্দ্রিয় ও সর্বপরিব্যাপ্ত। শঙ্কর একত্ববাদের সমর্থক। ("মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, জীবন ও কর্ম", পৃঃ ৬৪-৬৫)।

২. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪-৯৫।

৩. ঐ, পৃঃ ১১১-১১২।

৪-৫. ঐ, পৃঃ ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী ছিলেন, শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর আকীদার ঘোর বিরোধী । শাহ ওয়ালী উল্লাহ তাঁদের দু'জনের মধ্যে সমন্বয় করেন এবং বিভেদ দূরীভূত করেন । মাওলানা সিন্ধী তাই বলেন, শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইবনুল আরাবীর ওয়াহ্দাতুল অজূদের আকীদাকে বিশুদ্ধ মনে করতেন । তার সাথে তিনি ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেসানীর চিন্তাকেও নির্ভুল মনে করতেন। তাঁর বক্তব্যে দু'জন বুযুর্গের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। ইমাম রব্বানী যে চিন্তাকে ওয়াহ্দাতুশ শুহূদ বলে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাকেই ইবনুল আরাবী ওয়াহ্দাতুল অজূদের মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পেয়েছেন [১]। সুতরাং যারা ওয়াহদাতুল অজূদের আকীদাকে ইসলাম পরিপন্থী বা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন, তারা অবশ্যই ভুলের উপর আছেন। তবে অনুমান হয় যে, সিন্ধী ওয়াহ্দাতুল অজূদের এই ব্যাখ্যা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বার্থে দিয়েছিলেন। ছাত্রজীবনের প্রথম দিকে তিনি শুধু ইসলাম আর মুসলমানের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে ভারতীয় হিন্দু– মুসলিম সম্পর্ক এবং তাদের মধ্যকার ঐক্য ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে থাকেন । এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তবে ছাত্রজীবনে এক্ষেত্রে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার মত কোন সুযোগ তাঁর ছিলনা। জীবনে যখন রাজনৈতিক অঙ্গনে পা রাখেন, তখন থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি এ দিকে দিতে চেষ্টা করেন [২] এবং হিন্দু–মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে এ বিষয়ে মতামত পেশ করেন। তিনি যখন জমী'অতুল আনসারের প্রধান ছিলেন তখন থেকেই তিনি হিন্দু–মুসলিম ঐক্যের বিষয়ে ভাবতে থাকেন এবং জমী'অতুল আনসারের সভাসমূহে এ বিষয়ে জোর দিতে থাকেন । তিনি চিন্তা করতেন, নতুন পুরাতন সবার মধ্যে আগে ঐক্য ও সমঝোতার প্রয়োজন। তারপর আন্দোলনের অন্যান্য পদক্ষেপ [৩]।

১০ ডিসেম্বর ১৯৩৯ খৃঃ মাওলানা সিন্ধী "দারুর রাশাদ সিন্ধ সাগর" থেকে প্রকাশিত প্রবন্ধে সূফীবাদের ইতিহাস টেনে বলেন, "আলেকজান্দ্রিয়ায় "নেওপ্লেটোনিক" নামে একদল দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। সেই পথ অনুসরণ করে মুসলমানদের মধ্যে শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (১১৬৫ –১২৪০ খৃঃ) শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহ্রাওয়ার্দী (১১৪৫-১২৩৪ খৃঃ) প্রমুখ দার্শনিকের জন্ম হয়েছে। এসকল সূফী ইমামের দর্শনের প্রাণবিন্দু হল ওয়াহ্দাতুল অজূদ অর্থাৎ সর্ব আল্লাহবাদ। এ দর্শন বেদান্তবাদেরই সারসংরক্ষণ। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ ঐ দর্শনকে সংক্ষিপ্ত করে এর পূর্ণতা দান করেছেন। এর আলোকে মানবতাবাদ ও কুরআন –হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন[৪]"। মাওলানা সিন্ধী ঐ প্রবন্ধে সূফীবাদ সর্ম্পকে আরো বলেন, "সম্রাট আকবর"

---

১. সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৬।

২. "নকশ্–এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৫৪-১৫৫।

৩. "নকশ-এ হায়াত", ২য় খন্ড, পৃ: ১৫৪,১৫৫।

৪. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫৫৬-১৬০৫ খৃ:)– এর সময় থেকেই ভারতীয় মুসলিম চিন্তাবিদগণের একটি দল ইবনুল আরাবীর দর্শন বা বেদান্ত দর্শনের সংস্কার ও পূর্ণতা সাধনে লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয় জনগণের জীবনধারার উপযোগী একটি অভিন্ন রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি প্রস্তুত করা। যে দর্শন সব ধর্মের মধ্যে একটা ঐকমত্য ও সেতুবন্ধন তৈরী করতে পারে[১]। কিন্তু মাওলানা সিন্ধীর সে দর্শন ও ঐকমত্যের চিন্তা উপযুক্ত নয় বলেই প্রমাণ হয়েছে ; বরং তাঁর চিন্তা ও দর্শন নির্ভুল হলে ভারতবর্ষে এত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতনা। বৃটিশ আমলের গোড়া থেকেই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব চলে আসছে। কংগ্রেস ভারতীয় জনগণের- হিন্দু–মুসলিম সবার সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও এ দ্বন্দ্ব দূর হয়নি; বরং অমুসলমান সম্প্রদায় মুসলমান জাতির রাজনৈতিক অধিকার নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করেছে। দেখা গেছে, কংগ্রেসপন্থী মুসলমান কংগ্রেসপন্থী হিন্দুদের আক্রমণ থেকে এবং কংগ্রেসপন্থী হিন্দু কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি। যেহেতু মুসলমানদের একটি পরিষ্কার ধর্ম দর্শন, ধর্ম ভিত্তিক বিশ্বাস, ও স্বতন্ত্র শরীয়ত রয়েছে। যা চিরকাল তাদেরকে অন্যান্য জাতি থেকে স্বাতন্ত্রতা দান করেছে। ইসলামের তাওহীদ অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং সন্যাসবাদ ও সূফীবাদ দর্শন দিয়ে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়না। সূফী ও সন্যাসীগণ কখনো রাজনীতি করেননি[২]। ওয়াহ্দাতুল অজূদের ব্যাখ্যা ও বেদান্তবাদের দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষে হিন্দু–মুসলিম অনৈক্য দূর করার চেষ্টা করা, দূরাশা মাত্র। এসব কিছু ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে কোন ভূমিকা রাখতে পারেননি । এ দোয়াই দিয়ে কোন অমুসলমানকেও মুসলমান করা সম্ভব হয়নি।

১৯৪০ খৃ: ১১ জুলাই সিন্ধু প্রদেশের থাট্টায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সিন্ধী ইউরোপীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি , প্রযুক্তি ও শিল্প বিপ্লবকে স্বাগত জানান এবং ভারতবর্ষের জনগণের উন্নতির স্বার্থে তা প্রয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে ইউরোপের ধর্মহীনতা সর্ম্পকে তিনি আশংকা প্রকাশ করেন। তাঁর ধারণামতে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাথে ধর্মের সংযোগ নেই। যার ফলে মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করছে। সিন্ধীর মতে এ অবস্থায় ওয়াহ্দাতুল অজূদের দর্শন দ্বারা একজন বিজ্ঞানীকে আল্লাহতে বিশ্বাস করানো সম্ভব। যেহেতু ওয়াহ্দাতুল অজূদ এটা হিন্দু ধর্মের সার কথা। যে দর্শনের পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন ইমাম ওয়ালী উল্লাহ। সিন্ধীর এই আধ্যাত্মিক চিন্তার পেছনেও রাজনৈতিক মানস কাজ করেছে বলে ধারণা। তাই তাঁর চিন্তা জগতে আধ্যাত্মবাদ ও রাজনৈতিক একাকার হয়ে গেছে[৩]।

সিন্ধীর "ওয়াহ্দাতুল আদয়ান" (সকল ধর্মের উৎস এক) বক্তব্য দ্বারাও অনেকে মাওলানা সিন্ধী সর্ম্পকে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু মাওলানা সিন্ধী "ওয়াহ্দাতুল আদয়ান"

---

১. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮২-১৮৩।

২. ঐ, পৃ: ১৮৬-১৮৮।

৩. সারওয়ার মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫; সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৪-২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা এটা বুঝাতে চাননি যে, দুনিয়ার সব ধর্মই সমান, এসবের উপর ইসলামের কোন প্রাধান্য বা শেষ্ঠত্ব নেই এবং যার যেটি ইচ্ছা সেটি গ্রহণ করতে পারবেন । সিন্ধী সকল ধর্মের মূল বা উৎস এক মানা সত্ত্বেও ইসলামকে সর্বশেষ ধর্ম, সত্য ধর্ম এবং পবিত্র কুরআনকে আসমানী কিতাব হিসেবে মানতেন ও বিশ্বাস করতেন [১]। তিনি মনে করতেন, পবিত্র কুরআন একটি অপরিবর্তনীয় বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থা পেশ করেছে। এটা অবিনশ্বর। কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । মানুষের মুক্তি শুধু মাত্র কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব[২]। সিন্ধীর মতে ওয়াহ্দাতুল আদয়ান সত্ত্বেও প্রত্যেককে একটি স্বতন্ত্র ধর্মমত সম্পূর্ণ রূপে পালন করতে হবে। যখন যেটা ইচ্ছা তা পালন করলে চলবে না । আর ইসলাম হল দুনিয়াতে সবচেয়ে উন্নত ধর্ম । এর দ্বারা জীবনের শান্তি- শৃংখলা বজায় রাখা সম্ভব [৩]। সিন্ধী বলেন, "আজকে প্রতিটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গোষ্ঠী, জ্ঞানী-গুণী ও পন্ডিত সমাজ চেষ্টা করছেন, নিজস্ব চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থাকে বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে যে ধর্ম (ইসলাম) সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের ধর্ম, যে কিতাব (কুরআন) মানুষকে সামগ্রিক মুক্তি দিতে সক্ষম এবং সমগ্র মানবজাতিকে এক সত্ত্বা বলে ঘোষণা দিয়েছে; সে ধর্ম ও সে কিতাব থেকে মানুষ আজ বিচ্যুত[৪]" । তাঁর মতে পবিত্র কুরআন সব কয়টি সম্প্রদায়, জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম ও মাযহাবসমূহের কেন্দ্রবিন্দু । ইহা সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রযোজ্য। পবিত্র কুরাআন সবাইকে একত্রিত হওয়ার জন্য আহবান করেছে এবং সবাইকে একটি মূল অবলম্বনের মাধ্যমে মুক্তির ঘোষণা দিয়েছে। সুতরাং আজকে ইহুদী জাতি নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান বা আল্লাহর দোস্ত দাবী করে গুমরাহ হয়েছে। খৃষ্টানরা নিজেদেরকে আল্লাহর ছেলে দাবী করলেও কোন কাজে আসবে না। হিন্দুদের মধ্যেও মানবতার অনেক ঘাটতি রয়েছে। তারা শুধুমাত্র খেয়ালীর বশবতী হয়ে চলছে[৫] ।

সিন্ধী শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনের মধ্যে মানবতাবাদ, সমাজবাদ ও ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের উৎস খুঁজে পেয়েছেন বলে দাবী করেন। তাই নির্বাসন জীবন শেষে দেশে ফিরে হিন্দু –মুসলিম সবাইকে শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শন চর্চায় উৎসাহিত করেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শন চর্চার জন্য তিনি দিল্লীর "জামিয়া মিল্লিয়া"য় "বায়তুল হিকমত" নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন (১৯৪০ খৃ:)। লাহোর ও সিন্ধু হায়দারাবাদে প্রতিষ্ঠা করেন "সিন্ধ সাগর একাডেমী"। তিনি সূফীগণকে মানবতার সেবক বলে আখ্যায়িত করেন এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহকে এই জগতের সর্বোত্তম মনীষী হিসেবে অভিহিত করেন। তাঁর ধারনায় হিন্দু– মুসলিম ধর্মের সেবকগণ

১-২. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০-৬১।

৩. ঐ, পৃ: ৮৯-৯০।

৪. ঐ, পৃ: ৬১।

৫. ঐ, পৃ: ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর একত্মবাদে বিশ্বাস রেখে সামনে অগ্রসর হলে ভারতবর্ষ আরেকবার মিলনকেন্দ্রে পরিণত হবে[১]।

সিন্ধী সম্রাট আকবরের দ্বীনে এলাহীকে সমর্থন করতেন না। তিনি মনে করতেন, দ্বীনে এলাহীর ভাবুকরা ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। কারণ, ধর্মসমূহের অভিন্নত্ব মানার অর্থ হল, নৈরাজ্য সৃষ্টি করা। ধর্মীয় মতানৈক্য দূর করার জন্য এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা ধর্মকে ধ্বংস করার নামান্তর । আবার তিনি এও বলেন, আকবরের দ্বীনে এলাহীর ভিত্তি ওয়াহ্দাতুল অজূদের উপর[২]। আকবর রাজনৈতিক স্বার্থে দ্বীনে এলাহীর কূশলীনীতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর অমাত্যবর্গরা যদি দ্বীনে এলাহীর কূশলীনীতিকে যথাযথভাবে পালন করতেন, তাহলে পুরো ভারতবর্ষের হিন্দুরা মুসলমান হয়ে যেত" [৩]। সিন্ধী এও বলেন, " আকবরের শাসন ছিল ইসলামী শাসন । তবে গোড়ার দিকে ইসলামী শাসনকে রূপ দেয়ার জন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ইসলামী জাতীয়তাবাদের উপর প্রাধান্য দেন [৪]।

সিন্ধী ভারতীয় জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম তথা ভারতীয়ত্ব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, ভারতীয়ত্ব নিশ্চয় সম্মানের বিষয় । ভারতীয়ত্ব নিয়ে গর্ব করা উচিত । তিনি বলেন, " আমার মতে ভারতীয়ত্বের অর্থ হল, আমি একাধারে একজন মুসলিম ও ভারতীয়। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি আমার গর্ব [৫]।

মাওলানা সিন্ধী ওয়াহাবী মতবাদ অর্থাৎ আহলে হাদীসগণকে সমর্থন করতেন না। ওয়াহাবী মতবাদের প্রবক্তা মুহাম্মদ ইব্ন্ আব্দুল ওয়াহ্হাবকে শরীয়তের গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন লোক মনে করতেন না। তিনি নিজেকে একজন কাদেরী তরীকার ফকীর এবং আব্দুল কাদির জিলানীর (১০৭৭-১১৬৬ খৃ:) মুরীদ বলে পরিচয় দিতেন। তিনি সিন্ধু থেকে ওয়াহাবী মতবাদ উৎখাতের চিন্তা করেছিলেন । ওয়াহাবীদের ধারণামতে ইসলামে পীর- মুরীদী নেই। আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট আত্মসমর্পণ করা ও মাঝারে মান্নত করা শিরক্ । দু'আ করতে কোন পয়গাম্বর ও বুযুর্গের উসিলা গ্রহণ করা শির্ক্ । কিন্তু আহলুস্সুন্নাত ওয়ালজামা'আত (সুন্নী) পন্থীদের মতে পীর মুরীদী নিষেধ নয়। দু'আয় পয়গাম্বর বা বুযুর্গের উছিলা নেয়া তাওহীদ পরিপন্থী নয়। মাওলানা সিন্ধীর আমলে সিন্ধু প্রদেশে ওয়াহাবী ও সুন্নীদের মধ্যে দ্বন্ধ ছিল। তাই সিন্ধী ১৯৪৪ খৃ: ১৭ এপ্রিল হায়দারাবাদের এক অনুষ্ঠানে বললেন, ওয়াহাবী – সুন্নীদের এ দ্বন্ধ আমার কাছে ভাল লাগেনা"।

---

১. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ:২৪৩-১৪৬।

২. ঐ, পৃ: ২৪৫।

৩. ঐ, পৃ: ২৪৬-২৪৮।

৪. ঐ, পৃ: ২৫০-২৫১,২৮৫।

৫. উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, "শাহ ওয়ালী উল্লাহ আওর উনকা ফালসাফা", সিন্ধ সাগর একাডেমী, লাহোর, ১৯৪৪, পৃ: ২১৪-২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সে অনুষ্ঠানে সিন্ধী নিজেকে একজন কাদেরী তরীকার ফকীর বলে ঘোষণা করেন। উপমহাদেশের আহলে হাদীসগণ শাহ ইসমাঈল শহীদকে ওয়াহাবী মতবাদের প্রবক্তা বলে দাবী করে থাকেন। কিন্তু সিন্ধী তাদের ঐ দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে শাহ ইসমাঈলকে শহীদকে একজন হানাফী মাযহাবের অনুসারী বুযুর্গ বলে প্রমাণ দিতে চেষ্টা করেছেন[১]।

সিন্ধী শাহ ওয়ালী উল্লাহর উপর ভিত্তিহীন কথা বলারও অপচেষ্টা করেছিলেন। এতে পাঠকদের মনে শাহ ওয়ালী উল্লাহর প্রতি অভক্তি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। সম্রাট আকবর ও আলমগীর উভয়ের প্রতি শাহ ওয়ালী উল্লাহ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে সিন্ধী দাবী করেছেন। কিন্তু তাঁর এ বক্তব্য বাস্তবতার সাথে কোন মিল রাখেনা [২] ।

সিন্ধী ভারতীয় সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা সর্ম্পকে যথেষ্ঠ জ্ঞান রাখেতেন। তা সত্ত্বেও হিন্দু –মুসলিম সমন্বয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেন তিনি ইসলামী সভ্যতার কথা অনেকটা ভুলে যান। একমাত্র ১৯৪৪ খৃঃ লারকানা জেলার শাহাদত কোটে "মুহাম্মদ কাসিম ওয়ালী উল্লাহ থিয়লজিক্যাল কলেজ" উদ্ভোধনকালে লিখিত ভাষণে মুঘল সাম্রাজ্যের মুসলিম ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। সাধারণতঃ তিনি মুসলিম সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতার কথা পাশাপাশি আলোচনা করতেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচারের স্বার্থে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও রামায়ন গীতাকে এক সাথে চালাতে চেষ্টা করতেন। তবে তিনি সে ভাষণে ভারতীয় সভ্যতা ধর্মভিত্তিক এবং ইউরোপীয় সভ্যতাকে ধর্ম বির্বজিত বলে আখ্যায়িত করেন[৩]।

সিন্ধী ভারতীয় ভাষাসমূহকে ভারতের ঐতিহ্যবাহী অক্ষরে না লিখে রোমান অক্ষরে লিখার পরামর্শ দেন। ১৯৩৯ খৃঃ ৩ জুন কলিকাতায় জমী'অতে উলামায়ে ইসলামের অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় স্টাইলের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের আদেশ দেন। তাঁর নিকট ইসলামী বেশ-ভূষার কোন গুরুত্ব ছিলনা। তিনি পোশাক পরার কারণে কাউকে মন্দ বলা বা কাফের বলাকে গর্হিত কাজ বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, "শুধু পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ নয় বরং ধর্মের মূল উদ্দেশ্য পালন করা উচিত"[৪]। শুধু ধর্মের লেবাস–পোশাক ও রুসুম –রেওয়াজ দ্বারা ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়"। তিনি ধর্মের রুহ্ অর্থাৎ লক্ষ্য–উদ্দেশ্য সবার মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হোক। তাদের ভেতরের অনুভূতি জেগে উঠুক। মানুষের সর্ম্পক আল্লাহর সাথে প্রতিষ্ঠিত হোক। নামায, রোযা, হজ্জ্ব ,যাকাত ইত্যাদি আচার

---

১. উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, "শাহ ওয়ালী উল্লাহ আওর উনকি সিয়াসী তাহরীক", সিন্ধ সাগর একাডেমী, লাহোর, ১৯৫২, পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

২. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ২৮৪-২৮৬।

৩. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫।

৪. ঐ, পৃঃ ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

- অনুষ্ঠান আদায় করবে, সাথে সাথে অপরাধ জগৎ ও গুনাহর কাজে লিপ্ত হবে; সেটা তিনি কামনা করেননি [১]। তিনি স্পষ্ট বলতেন, "তোমরা এই যে খেলনার ঘর তৈরী করেছো এবং একেই বিশাল আসমান বলে বিশ্বাস করে নিয়েছো; কালের প্রবাহে তা টিকে থাকতে পারবে না। তোমাদের সভ্যতা- সংস্কৃতি, তোমাদের সমাজ, তোমাদের চিন্তাধারা, তোমাদের রাজনীতি এবং তোমাদের অর্থনীতি সবকিছুর মধ্যে ঘুণ ধরেছে। অথচ একেই তোমরা ইসলামী সভ্যতা নাম দিয়েছ। বাস্তবে এতে ইসলামের কোন চিহ্ন নাই। তোমরা তোমাদের গোড়ামীকেই মাযহাবের নামে চালিয়ে নিচ্ছো। মুসলমান হতে চাও তো ইসলাম কি? তা আগে বোঝ। তোমরা যাকে ইসলাম বলছো, ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তোমাদের নেতৃবৃন্দ পদমর্যাদা লোভী, তোমাদের শাসকবৃন্দ ভোগ-বিলাসী এবং তোমরা জনসাধারণ বিভ্রান্ত । জাগো ! পরিবর্তন আনো! অন্যথায় তোমাদের চিহ্ন পর্যন্ত মিটে যাবে[২]"।

মাওলানা সিন্ধী ভারতে ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লব আনার সাথে সাথে ইউরোপীয় জীবন পদ্ধতি ও ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের আহবান জানান। তবে এটা বোধগম্য নয় যে, ভারতে ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লব আনার সাথে সাথে ইউরোপীয় জীবন পদ্ধতি ও ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের কি সম্পর্ক ? অথচ তাঁর বক্তব্যসমূহ পাঠ করলে বুঝা যায়, তিনি ছিলেন ইসলামিক স্যোসালিষ্ট । তিনি রাশিয়ায় দেখা সমাজ বিপ্লব এবং আধুনিক তুরস্কে দেখা কামাল পাশার সংস্কার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদ ভারতে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তবে ইউরোপের ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দিতে চাননি। তাঁর ভাষায়, "পুঁজিবাদী সমাজ ও সাম্যবাদী সমাজ উভয়ের নেতারা ধর্মদ্রোহী। সাম্যবাদীরা ধর্মদ্রোহীতার বিষয়টি গোপন রাখার প্রয়োজনীয়তা মনে করেন না। তারা প্রকাশ্যে ধর্মের উপর হামলা করে । পুঁজিবাদীরা প্রকাশ্যে ধর্মের বিরোধীতা করেনা; বরং তারা রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য ধর্ম ও ধর্মীয় লোকদের ব্যবহার করে। কিন্তু মনে- প্রাণে তারা ধর্মের বিরোধীতা করে[৩]"। সিন্ধী এও বলেন, "তুরস্কে কামালবাদের সাথে ধর্মহীনতা প্রবেশ করেছে । আমরা এ ধর্মহীনতার প্রশ্নে নীরব থাকতে পারিনা। এ ধর্মহীনতা রুখে দাঁড়াবার জন্য শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর শিক্ষা ও কর্মসূচী আমাদের অত্যাবশ্যক[৪]"।

সিন্ধী প্রথম জীবনে সরাসরি জিহাদের পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পরিকল্পিত বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর বলেন, জিহাদের অর্থ সমাজ বিপ্লব । তাঁর মতে জিহাদের দু'টি স্তর রয়েছে। ১. দেশে মুসলমান শাসক থাকবে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত সমরশক্তিও থাকবে। তখন জিহাদ করা। ২. এমন হতে পারে যে, মুসলমান শাসক এবং সামরিক

---

১. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ:৭৭-৮০।

২. নূর উদ-দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০।

৩. "শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ আওর উনকি ফালসাফা", পৃ: ১৫১-১৫৪।

৪. "শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ আওর উনকি সিয়াসী তাহরীক", পৃ: ১২৭-১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

শক্তি কোনটাই থাকবেনা। এ অবস্থায় মুসলমানদের কর্তব হবে, নিজেরা দল গঠন করে জিহাদে লিপ্ত হওয়া । হেযায থেকে ফিরে এসে তিনি দেশ বাসীকে শেষোক্ত জিহাদের তা'লীম দেন[১] ।

সিদ্ধীর মতে যে যুগ চলে গেছে সেটি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। যে পানি গড়িয়ে যায় সেটি ফিরে আসে না। তাই খিলাফতে রাশেদার হুবহু শাসন ব্যবস্থা বর্তমান যুগে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়; বরং ঐ শাসনের মৌলিক কাঠামো বজায় রেখে যুগের প্রেক্ষাপটে কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে। তাঁর ভাষায়, "অতীত গৌরবের কথা আলোচনা করে লাভ নেই। চলে যাওয়া যুগ ফিরে আসে না । কুরআনের আলোকে খিলাফতে রাশেদার শাসন প্রতিষ্ঠা বর্তমানে সম্ভব নয়[২]"। মাওলানা সিদ্ধীর এ বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, খিলাফতে রাশেদার যুগ ছিল সম্পূর্ণ কুরআন –হাদীসের ভিত্তিতে পরিচালিত খিলাফত ব্যবস্থা। আজ ১৪০০ বছর পর হুবহু সে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়!" সিদ্ধীর এ বক্তব্যে অনেকেই আপত্তি করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ইসলামের অপব্যাখ্যার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এবং তাঁকে রূঢ় ভাষায় মন্দ বলেছেন। কিন্তু সে ধারণা ভুল; বরং তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, খিলাফতে রাশেদার শাসন ব্যবস্থাই শুধুমাত্র কুরআনী শাসনব্যবস্থা নয়; বরং উমাইয়া শাসন, আব্বাসীয় শাসন, মিসরের ফাতেমী শাসন, স্পেনের মুসলিম শাসন, সমরকন্দ, বুখারা ও গজনীর মুসলিম শাসন ইত্যাদিও কুরআনী শাসন ছিল। যদিও সে গুলো হুবহু খিলাফতে রাশেদার নমূনার উপর ছিলনা। মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের শাসনকার্যে কম-বেশী কুরআনী হুকুমত চালু ছিল। যা আজকেও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব । তাই তিনি বলেন, "কুরআনী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা আজও সম্ভব। তবে এর জন্য প্রয়োজন পবিত্র কুরআনকে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা হৃদয়াঙ্গম করা[৩]"। সিদ্ধী আরো বুঝাতে চেয়েছেন যে, কুরআনী শাসন ব্যবস্থা সর্বযুগেই হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খৃ:) -এর শাসনের মত সাদাসিদে থাকবে না; বরং অনারবদের মধ্যে ভীতি ও প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে হযরত মু'য়াবিয়া (রা.) (৬৬১-৬৮০ খৃ:)-এর মত হওয়ারও প্রয়োজন আছে । তাই হযরত মু'য়াবিয়ার শাসনকে গায়রে কুরআনী বলা সমীচীন হবে না; বরং পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট ও সময়ানুপযোগিতার কারণে শাসকগণের মধ্যেও পরিবর্তন আসতে পারে[৪]। খিলাফতে রাশেদার যুগে তীর, কামান, তলোয়ার ছিল যুদ্ধাস্ত্র। পরিবহণের জন্য ছিল উট, ঘোড়া। কিন্তু আজকের ট্যাংক, কামান, মিজাইল ও যুদ্ধ বিমানের যুগে সম্ভব নয় যে, খিলাফতে রাশেদার তীর, ধনুক ও তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করা । মানুষের জীবনে এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আসতে বাধ্য [৫]। তবে এই পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানিয়ে দেয়া; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য, ফকীহগণ যেখানে যে বিষয়টি

---

১. সারওয়ার, মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫০-১৫২।

২. ঐ, পৃ: ৮৫; সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৩।

৩-৪. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪-৬৫,৬৭।

৫. ঐ, পৃ: ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন যোগ্য মনে করেন, সেখানে পরিবর্তন আনা। যেমন হযরত'উমরের যুগে কৃতদাস বানানো বৈধ ছিল, কিন্তু আজকের বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে যদি মুসলিম জাহানের রাষ্ট্রপ্রধান এটিকে বন্ধ করে দিতে চান, তাহলে সেটা জায়িয হবে । শুধু জায়িয নয়; বরং সেটিকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া কর্তব্য[১]।

খিলাফতে রাশেদার যুগে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি –গোষ্ঠীর সাথে রাজনৈতিক ও আন্ত র্জাতিক সম্পর্ক, বিধি- বিধান ও বাণিজ্য নীতি তৎকালীন প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতির আলোকে নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু আজ বিশ্ববাণিজ্যের নিয়ম-নীতিতে ব্যপক পরিবর্তন এসেছে, সুতরাং আজকে মুসলমানদেরকে এ বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। দুনিয়ার অন্যান্য জাতির সাথে মুসলমানদের কি ধরণের সম্পর্ক থাকবে তা নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে [২]। সাথে এ বিষয়টিও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খৃ:), হযরত'উমর ও অপর দুইজন খলীফার যুগে হযরত সাআদ ইবন্ ওয়াক্কাস, আবু মূসা আশ'আরী, মুগীরা ইবন্ শোঁবা, খালিদ ইবন্ ওয়ালিদ (রা. আনহুম)– এর ন্যায় দেশ প্রেমিক, ইসলাম প্রেমিক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সাহাবা ও তাবেয়ীন–এর ন্যয় দ্বীনদার পৃথিবীতে পুনরায় জন্মাবেন না। সুতরাং খিলাফতে রাশেদার হুবহু কুরআনী শাসন ব্যবস্থা বর্তমানে পতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়; একথা বলা একেবারে অসত্য নয় [৩]। আর যদি সেটা সম্ভব হত, তাহলে মহানবী (সা.) একথা আগাম ঘোষণা দিতেন না যে, আমার (মৃত্যুর) পর খিলাফত ত্রিশ বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। এর পর শুরু হবে কষ্টকর রাজত্বের যুগ । আজ ইসলামের ইতিহাস একথার বাস্তব প্রমাণ দিচ্ছে যে, খিলাফতে রাশেদার পর পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোথাও খিলাফত মিনহায আলাননবুওয়্যাত প্রতিষ্ঠি হয়নি। এমনকি হযরত 'উমর ইবন্ 'আব্দুল 'আযীয (র.) খিলাফত মিনহায আলান্নবুওয়্যাত প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে নিজের ঘরের লোকদের বিদ্রূপ ও বিদ্রোহের সম্মুখীন হন । অবশেষে মাত্র দু'বছর খিলাফতে আসীন থাকার পর শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। সুতরাং যে জিনিস খায়রুলকুরূন (উত্তম যুগ) –এর যুগে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি, তা আজকের ফিতনার যুগে কেমনে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব [৪]।

তবে মাওলানা সিন্ধীর চিন্তা- চেতনা ও প্রকৃতি ছিল সুস্থ সুন্দর এবং তিনি ছিলেন ইসলামের উপর দৃঢ় প্রত্যয়ী তার প্রমাণ রয়েছেঃ দেওবন্দে অবস্থানকালে তাঁর চিন্তা– গবেষণা ও দর্শনের উৎস ছিল কুরআন, হাদীস ও হুজ্জাতুল্লাহিলবালিগাহ। রাশিয়া, তুরস্ক ও মক্কায় জ্ঞান সাধনার উৎস হিসেবে সে তিনটিকে অনুসরণ করেছেন। তাতে কোন পরিবর্তন আনেননি । তবে

১-২. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৯,৭০।

৩. ঐ, পৃ: ৭২-৭৩।

৪. ঐ, পৃ: ৭২-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাহ্যিক আচার-আচরণ, পোশাক ইত্যাদিতে আলিমানা লেবাস ধরে রাখতে পারেননি। তাঁর চিন্তা, গবেষণা ও কর্মে কোন ইউরোপীয় বা কোন সমাজবাদী নেতার রেফারেন্স দেননি; বরং কুরআন, হাদীস ও শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনকে সর্বদা উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন[১]।

সিন্ধী মুসলমানদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দময়ী জীবন কামনা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, মুসলমানদের ধর্ম-কর্ম সম্পূর্ণ বজায় থাকুক সাথে সাথে তারা অর্থনৈতিক উন্নতিও লাভ করুক। একজন ইসলামিক সোস্যালিস্টরূপে তিনি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক এবং ইহকাল ও পরকালের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন সৃষ্টির পয়গাম ভারতবাসীর সামনে পেশ করেন। কর্মজীবনে তিনি সফলতা যতটুকুই লাভ করুননা কেন, তাঁর আন্তরিকতার যে কোন অভাব ছিল না, এটা এক'শ ভাগ সত্য কথা। এমন একজন সমাজ চিন্তাবিদ, সংগ্রামী নেতা, জনদরদী ও মরদে মু'মিন আজকে আমাদের সমাজে খুঁজে পাওয়া ভার[২]।

তিনি বলেন, আমি চাই, ইউরোপের ঐ জাগতিক উন্নতিকে গ্রহণ করা হোক। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতিকে আমরা আমাদের জীবনের ভিত্তি বলে গ্রহণ করি। তবে এমনটি মনে করা যাবেনা যে, বিজ্ঞানই জীবনের সব কিছু। এজড় পৃথিবীতে বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করেছে, তা সত্য বটে, কিন্তু জীবন শুধু জড় পৃথিবীকে নিয়ে নয়; বরং জড় পৃথিবী অন্য একটি সত্তার পরিচয় বহন করে। যে সত্তাই প্রকৃত জীবনের উৎসমূল[৩]।

---

১. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০।

২. "মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীঃ "জীবন ও কর্ম ", পৃ: ৯৪।

৩. ইকরাম, এস, এম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬৫-৩৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৬
জীবনধারা

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর ব্যক্তিত্ব ও জীবনধারা ছিল অত্যন্ত সাদাসিদে। যে জীবনে ছিলনা কোন অহংকার ও গরিমা। তিনি ছিলেন একজন সাচ্চা মনের অধিকারী মু'মিন। সিন্ধীর জীবনধারা সর্ম্পকে মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী তাঁর অভিজ্ঞতার কথা এ ভাবে তুলে ধরেনঃ " মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর নাম ছোটকাল থেকেই শুনে আসছিলাম । তাঁর ইলম্ , প্রজ্ঞা ও সংগ্রামী জীবন সর্ম্পকে লোকমুখে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছিল। তাই মাওলানা সিন্ধীকে দেখার বাসনা ও কৌতূহল ছোটবেলা থেকেই জন্ম হয়েছিল। একদিন সে সুযোগ এসে গেল । ১৯৩৯ খৃঃ হঠাৎ শুনলাম , দীর্ঘ ত্রিশ বছরের নির্বাসন জীবন শেষে মাওলানা সিন্ধী মাতৃভূমি ভারতে ফিরছেন। জাহাজ থেকে করাচী বন্দরে নেমে সোজা দিল্লী চলে আসবেন। এ সংবাদ শোনার পর ঘড়ির কাঁটার মত প্রতিটি মুহূর্ত আগ্রহ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটতে থাকে। অবশেষে সে সময়টি সামনে এসে উপস্থিত হল। নির্দিষ্ট দিনে আমরা মাওলানাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছলাম। দেশের আলিম, পন্ডিত ও সুধীজনকে আমরা যেভাবে জীবনে পোশাক, বেশ-ভুষা ও জীবনাচারে দেখে অভ্যস্ত, সে অনুপাতে ভাবলামঃ মাওলানা সিন্ধীর মাথায় থাকবে পাগড়ী, দেহে থাকবে বিশাল জোব্বা, ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর কামরায় করে ভ্রমণ করে আসবেন, সাথে থাকবে কমপক্ষে একজন খাদিম, দু'তিনটি ভারী ভারী সুটকেস, একটি ভারী বেডিং, লিকুইড বোতল, নাস্তার সরঞ্জামাদী ইত্যাদি। আর চেহারায় থাকবে গৌরবমাখা গাম্ভীর্য ! কিন্তু ট্রেন যখন ষ্টেশনে এসে থামল, তখন আমার সব ভাবনা ভেস্তে গেল। সকলেই তাঁকে খুঁজতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা সমূহের সামনে ছুটাছুটি করতে লাগলেন । কিন্ত না সেগুলোতে নেই । এরই মধ্যে দেখলাম, এক ব্যক্তি উদোম মাথা, খদ্দরের জামা – পায়জামা পরিহিত এবং খদ্দরের একটি সাদা চাদর গলায় লটকানো অবস্থায় তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে বেড়িয়ে এসে ফ্লাটফর্মে দাঁড়ালেন। পূর্ব থেকে পরিচিতজনরা তাঁকে চিনলেন এবং তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। বুঝতে পারলাম , ইনি মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী । মাথার চুল ও দাঁড়ি সম্পূর্ণ সাদা, বয়স ৬০ /৭০ এর মধ্যে হবে । তবে দেহটি বেশ মজবুত প্রকৃতির। চেহরায় অসাধারণ দীপ্তি, মাহাত্ম ও আভিজাত্যের ছাপ। মুখ-মন্ডলে সংগ্রামী চেতনা ও সাহসিকতার প্রত্যয়। কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সাহসী । যেন একজন সৈনিক যুদ্ধের এক ময়দান থেকে অপর ময়দানে এসেছেন এবং একটি নতুন সৈন্য ছাউনী দখল করেছেন। উপস্থিত সবাই মাওলানার মাল–সামান নামানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কিসের সামান ! মাওলানার শরীরে যে সামান ছিল সেটিই শুধু তাঁর সামান। বাকী আল্লাহর নামে ভরসা। আমি দুনিয়াতে অনেক আলিম দেখেছি, দরবেশ দেখেছি, দুনিয়াত্যাগী ও সংসার ত্যাগী দেখেছি, রাজনীতিক ও কূটনীতিক দেখেছি, কৃষক শ্রমিকের জীবন দেখেছি ; কিন্তু দুনিয়া ও ভোগের প্রতি অনাসক্ত এমন একজন পূর্ণাঙ্গ কলন্দর

Dhaka University Institutional Repository

(নিজের দেহ ও পার্থিব সব কিছু থেকে উদাসীন) মাওলানা সিন্ধীর ন্যয় অন্য কাউকে আজ পর্যন্ত দেখিনাই এবং ভবিষ্যতে দেখতে পারব না বলে ধারণা [১]। মূলত এটাই ছিল এই সংগ্রামী মনীষীর জীবনধারা । সারাটি জীবন তিনি এভাবেই কাটিয়েছেন। বিলাসিতা, প্রাচুর্যতা ও আরাম–আয়েশ কোনটাই তাঁর ভাগ্যে ছিলনা এবং সে গুলো তিনি গ্রহণও করেননি।

সিন্ধী দিল্লী পৌছে সর্বপ্রথম জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার মেহমানখানা "কারুলবাগে" অবস্থান করেন।সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর মাওলানা সিন্ধী জামিয়ানগর উখলায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি, জুমু'আর নামায নিয়মিত উখলা থেকে আট মাইল দূর দিল্লীর জামে মসজিদে এসে আদায় করতেন। এ রাস্তাটুকুর বাস ভাড়া আদায় করার সামর্থ না থাকার কারণে তিনি পায়ে হেটে যাতায়াত করতেন। প্রচন্ড গরমের সময়ও তিনি এ কাজ করতেন । অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে তাঁর এই পায়ে হাটার কষ্ট চেহারা ও আলাপচারিতা কোনটাতেই ফুটে ওঠতনা। এমনকি সে কষ্টের কথা তিনি জীবনে কাউকে বলেননি [২]।

মাওলানা সিন্ধী তাঁর দীর্ঘদিনের নির্বাসিত জীবনে কখন শান্তি ও স্বস্থিতে ঘুমোতে পারেননি, শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে স্বাধীন করার চিন্তায় । তিনি চেয়েছিলেন, পবিত্র স্বাধীন মাতৃভূমিতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে। নির্বাসিত জীবন শেষে তিনি দিল্লীতে ফিরে আসার পর মাওলানা আতিকুর রহমান উসমানী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "হযরত ৩০ বছরের নির্বাসিত জীবনে কি আরাম আয়েশ ও আনন্দে আপনার কোন সময় বা মুহূর্ত কেটেছে? সিন্ধী উত্তর করলেন, মুফতী সাহেব!আপনি বিশ্বাস করুন, এই ৩০ বছরের মধ্যে একটি রাতও এমন আসেনি, যে রাতে আমি আরাম ও স্বস্থিতে ঘুমোতে পেরেছি। ভারতে ফেরার পর তবে আরামে ও নিশ্চিন্তে ঘুমালাম[৩]। মাওলানা সিন্ধী যখন দিল্লীতে অবস্থান করতেন, তখন দিল্লীর জামে মসজিদের নিকটেই মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস মিরাঠীর বিশাল বাড়ী ছিল। জুমু'আর নামাযের পর দিল্লীতে অবস্থানকারী দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন ছাত্রগণ সেখানে সমেবেত হতেন এবং পরস্পর মতবিনিময় করতেন। মাওলানা সিন্ধীও সে বৈঠকে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। তখন তিনি সেখানে উপস্থিতদেরকে অল্প অল্প করে হুজ্জাতুল্লাহিলবালিগা পড়াতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা পেশ করা । অতপর মূল আলোচনা করা। তারপর শ্রোতাদের মতামত ও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রতি শুক্রবারে জুমু'আর নামায আদায় করে ঐ বৈঠকে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি পায়ে হেটে যেতেন। জুমু'আর নামাযের অনেক আগেই তিনি দিল্লী পৌছে যেতেন, আবার আসর নামায সেরে সেখান থেকে পায়ে হেটে বিদায় হতেন[৪]।

---

১. আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১০-৪১১।

২-৩. ঐ, পৃ: ৪১১।

৪. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সিন্ধী অমুসলিমদের সামনে ধর্ম বিষয়ে কথা বলার সময় একটি বিশেষ থিউরির প্রতি খেয়াল রাখতেন । সেটি হলঃ আধুনিক যুগের মেধা মনন ধর্মকে সেই পুরোনো পদ্ধতিতে বুঝতে সক্ষম নয়, যে পদ্ধতিতে পুরোনো দিনে একজনকে ধর্মের হাকীকত বুঝানো যেত। যেমন –একজন ইউরোপীয় বিজ্ঞানীর সামনে ধর্ম ও আখলাকের গুরুত্ব আলোচনার পর আখিরাত সর্ম্পকে আলোচনা করলে তার মেধা সেটাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে । পক্ষান্তরে সে ধর্মকে একটি মানব জীবনের সুশৃংখল বিধি-বিধান ও রীতি-নীতির ধর্ম হিসেবে বুঝতে চায় । অর্থাৎ যদি কোন সত্য ধর্ম থাকে, তাহলে সেটা আধুনিককালে উন্নত জীবন ব্যবস্থার জন্য কতটুকু উপযুক্ত, এর জন্য সে কি করতে পারে, ঐ ধর্মের অনুসারী হলে অপর সম্প্রদায়ের সাথে তার কোন ধরনের সর্ম্পক স্থাপিত হবে, তাদের জীবন, জীবিকা, অর্থ ব্যবস্থা কোন ধরণের হবে; ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাকে ধর্ম সর্ম্পকে জ্ঞান দেয়া সম্ভব । মাওলানা সিন্ধী বলেন, "তোমরা যখন অমুসলিমদের সাথে কথা বলবে তখন সম্পূর্ণ সমর্থনকারী হিসেবে কথা বলবে। যেন দু'জন অমুসলিম পরস্পর কথা বলছে। অতঃপর তার সামনে ইসলামকে একটি উন্নত চিন্তাশক্তি সম্পন্ন উন্নত জীবন ব্যবস্থার ধর্ম হিসেবে পেশ করবে। তাহলে দেখবে, এতে দু'টি ফলাফল বেরিয়ে আসবে । ১. সে তোমার বক্তব্য প্রশস্ত মন নিয়ে আগ্রহের সাথে শুনবে । ২.যখন সে দেখবে যে, ইসলাম একটি উন্নতমানের পূর্ণাঙ্গ ধর্ম এবং উন্নত জীবন ব্যবস্থা ও মানুষের জান মালের নিরাপত্তার বিধান করতে সক্ষম ; তখন সে ইসলাম গ্রহণ করবে। তার অন্তরে ইসলামের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হবে[১]।

মাওলানা সিন্ধী নীতিনিষ্ঠ লোক ছিলেন । বিবেককে কখনো বিসর্জন দেননি । তাঁর মধ্যে কপটতা ও কৃত্তিমতা ছিলনা। অন্তরে যা বিশ্বাস করতেন, তা প্রকাশ করার সৎসাহস তাঁর ছিল । নিজের বিবেক, বুদ্ধি, বিবেচনা অনুযায়ী তিনি চলতেন ও বলতেন । কোন রূপ বাধা, বিপত্তি,ও প্রতিবন্ধকতার সামনে মাথা নত করতেন না । ব্যক্তিত্বের হোক বা ধর্মের হোক যে কোন বাধার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করতেন [২]।

---

১. সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৫-৭৬।

২. নূর উদ-দীন আহমদ (অনূ), প্রাগুক্ত, পৃ:৮

Dhaka University Institutional Repository

-একশবার-

উপসংহার

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র:) একটি অমর নাম, একজন মর্দে মুজাহিদ, দেশ প্রেমিক, প্রগতিশীল চিন্তাধারার সংগ্রামী আলিম, বিশিষ্ট সংগঠক, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বপ্নদ্রষ্টা ও কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ইসলাম ও দেশকে তিনি মনে- প্রাণে ভালবাসেন, বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সংগ্রাম করেন, কঠিন ত্যাগ স্বীকার করেন, জেল- যুল্‌ম ও নির্যাতন ভোগ করেন। একজন শিখ ধর্মান্তরিত নওমুসলিম হওয়ার পরও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি যে অবদান রাখেন, তা নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। দেশের স্বাধীনতা অর্জন উদ্দেশ্যে কাবুল গমন করেন এবং সেখানে সাত বছর অবস্থান করে আযাদীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর কাবুল অবস্থানকালীন সময়ের কূটনৈতিক তৎপরতা সম্বলিত কাহিনী নিয়ে লিখা "যাতী ডায়েরী " বা "আত্মজীবনী" ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মূল্যবান দলীল এবং তাঁর "রেশমী রুমালপত্র" বা "রেশমী রুমাল আন্দোলন" বৃটিশ বিরোধী ষড়যন্তের চাঞ্চল্যকর বিষয় হিসেবে গণ্য হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কাবুল ত্যাগ করে প্রথমে রাশিয়ায় গিয়ে সেখানকার সমাজ বিপ্লব, অতঃপর তুরস্কে গিয়ে কামাল পাশার ধর্ম - নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ পত্যক্ষ করেন। অতঃপর মক্কায় গিয়ে দীর্ঘ বার বছর অবস্থান করেন। মক্কায় অবস্থানকালীন সময় তিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহর রচনাবলী গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেন এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শন ও প্রগতিবাদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির চিন্তা করেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বড় কৃতিত্ব ছিল, তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য দুঃসাহসিক প্রক্রিয়ার পথ অবলম্বন করেন। শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসানের দেয়া রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ছিল, মৃত্যু বিভীষিকা সম্পন্ন দুঃসাহসিক কর্ম; তথাপি তিনি পিছপা না হয়ে অত্যন্ত সাহসের সাথে সে দায়িত্ব পালন করেন। সিন্ধী জীবনে কখনো নৈরাশ হননি। যেখানে বীরবিক্রমে ভূমিকা রাখার প্রয়োজন ছিল, সেখানে সেভাবেই ভূমিকা রাখেন। যেখানে কূটনৈতিক তৎপরতার প্রয়োজন ছিল, সেখানে সেভাবেই ভূমিকা রাখেন। সিন্ধীর রাজনৈতিক জীবনের চিন্তাধারা ও কর্মসূচীর উপর গবেষণা করলে, এ তথ্যটি বেড়িয়ে আসে যে, তিনি রাজনৈতিক জীবনের গোড়াতে ছিলেন, মুজাহিদ, সংগ্রামী নেতা ও বৃটিশ দুশমন। কাবুল গিয়ে হন সফল কূটনীতিক, অস্থায়ী ভারত সরকারের স্বদেশমন্ত্রী এবং যুনূদুল্লাহ সংগঠনের অধিনায়ক। রাশিয়ায় গিয়ে হন সমাজবাদের ভক্ত। তুরস্কে গিয়ে মুগ্ধ হন কামাল পাশার জাতীয়তাবাদ ও সংস্কার আন্দোলন দেখে। সৌদী আরবে গিয়ে হন জ্ঞান সাধক, গবেষক ও শাহ ওয়ালী উল্লাহর আর্থ-সামাজিক চিন্তাধারার বিশ্লেষক। আর দেশে ফিরেন একজন বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক সেজে। তখন রাজনৈতিক কার্যক্রম বক্তৃতা ও লিখনির মধ্যে সীমিত রাখেন। তিনি দীর্ঘ ২৪টি বছর ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে যাযাবরের মত ঘুরেন এবং সেখানকার হাল অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন । ফলে ইসলাম সর্ম্পকে তাঁর চিন্তাধারায় আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয়। কিন্তু তাঁর মৌলিখ চিন্তাধারা যা ছিল কুরআন, হাদীস, ধর্মীয় ইমাম ও নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারার অনুকূল; তা থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। তিনি ইসলামকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেন, মাতৃভূমির স্বাধীনতা এবং ইসলামের জন্য সংগ্রাম করেন এবং সে উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ২৪ বছর নির্বাসিত জীবন কাটান। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মাতৃভূমির স্বাধীনতা তিনি নিজ চোখে দেখে যেতে পারেননি!

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

যে সব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

অতুল চন্দ্র রায়, ডঃ , প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ **ভারতের ইতিহাস**
মৌলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা, ২০০১।

'আব্দুল 'আযীয, শাহ ঃ **ফাতাওয়া আযীযিয়া**
১ম খন্ড
মাতবা–এ মুজতবায়ী, দিল্লী, তা: বি: ।

আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলী (অনূ) ঃ **ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম**
(মাওলানা আবুল কালাম আযাদ)
স্বপ্নিল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯।

আব্দুল জলীল, এ,এম, এম ঃ **দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ**
ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৩।

আব্দুল্লাহ্, মুহাম্মদ, সৈয়দ (সম্পাদিত) ঃ **দায়েরা–এ– মা'আরিফ–এ –ইসলামিয়্যাহ্**
১২খন্ড
পাঞ্জাব ইউনির্ভাসিটি, লাহোর, ১৯৭২।

আব্দুল মান্নান, সৈয়দ (অনূ) ঃ **মুজাহিদ বাহিনীর ইতিবৃত্ত**
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮

আনিস সিদ্দিকী ঃ **হতভাগ্য বাদশা আমানুল্লাহ**
তারিক সিদ্দিকী, খুলনা, ১৯৬৯।

আলতাফ হুসাইন হালী ঃ **হায়াতে জ্বাদীদ**
নয়াদিল্লী, ১৯৭৯।

আব্দুর রহমান, মাওলানা ঃ **তাহরীকে রেশমী রুমাল**
লাহোর ক্লাসিক, ১৯৬০।

'আব্দুর রশীদ আরশাদ ঃ **বীস বড়ে মুসলমান**
(নবম সংস্করণ)
মাকতবা-ই রশীদিয়্যাহ, লাহোর, ১৯৯৯।

আসগর হুসাইন, সায়্যিদ ঃ **হায়াতে শায়খুল হিন্দ**
ইদারা-এ ইসলামিয়াত, লাহোর, ১৯৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহ , মুহাম্মদ, ড. ঃ **স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা**
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২।

ঃ **মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর**
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭।

ঃ **মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীঃ জীবন ও কর্ম**
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২।

ইনাম–উল– হক, মুহাম্মদ,ড. ঃ **ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন**
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

ইনতিযামুল্লাহ, মুফতী ঃ **মাশাহীরে জঙ্গে আযাদী**
মুহাম্মদ সাঈদ এন্ড সন্স, করাচী, ১৩৭৬ হি.।

ইদ্রীস হুশিয়ারপুরী ঃ **খুতুবাতে মাদানী**
যমযম বুকডিপো, দেওবন্দ, ১৯৯৭।

ইকরাম এস, এম, ঃ **মওযে কাওসার**
তাজকোম্পানী, দিল্লী, ১৯৯১।

ওয়ালী উল্লাহ (র.), শাহ্ ঃ **হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা**
(উর্দূ সংস্করণ)
ইসলামী একাডেমী, উর্দূবাজার, লাহোর, ১৯৮৪।

ইসমাঈল শহীদ, শাহ্ ঃ **তাকবিয়াতুল ঈমান**
মাকতবাহ থানবী, দেওবন্দ, ১৯৮৪।

গোলাম রসূল মিহ্র ঃ **সরগুযাশত–এ মুজাহিদীন**
কিতাব মনযিল, লাহোর, ১৯৫৬

গোলাম আহমাদ মোর্তজা ঃ **চেপে রাখা ইতিহাস**
(৮ম সংস্করণ)
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, বর্ধমান, ২০০০।

তাহির, মুহাম্মদ, মাওলানা ঃ **মাল্টার বন্দি**
মদনী মিশন, কলিকাতা, ১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

নূর মোহাম্মদ আ'জমী (র.), মাওলানা ঃ **হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস**
(৪র্থ সংস্করণ)
ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯২।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, মাওলানা ঃ **শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মদনী (র.)ঃ জীবন ও সংগ্রাম**
জামান প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৯১।

মুহাম্মদ শফী (র.), মুফতী ঃ **মেরে ওয়ালিদ মাজিদ**
করাচী, ১৯৭৫।

মুহাম্মদ মিয়াঁ, সায়্যিদ ঃ **আসীরানে মাল্টা**
আল-জমইয়্যাত বুকডিপো, দিল্লী, ১৯৭৬।

ঃ **উলামা –এ হক**
১ম খন্ড,
দিল্লী, ১৯৪৬

ঃ **উলামায়ে হিন্দ-কা- শানদারেমাযী**
৪র্থ খন্ড,
কিতাবিস্তান, দিল্লী, ১৯৮৫।

মুজীবুর রহমান, মওলানা ঃ **মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর রোজনামচা**
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

মাহমুদুল হাসান, সৈয়দ, ড. ঃ **ভারতবর্ষের ইতিহাস**
গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯।

মোদাব্বের, মোহাম্মদ ঃ **ইতিহাস কথা কয়**
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭।

মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা ঃ **আযাদী আন্দোলন– ১৮৫৭**
মদীনা পাবলিকেশন্স ঢাকা, ১৩৮৯ বাং।

মাহবূব রিযবী, সায়্যিদ ঃ **তারীখে দারুল'উলূম দেওবন্দ**
১ম খন্ড,
ইদারা–ই– ইহতিমাম দারুল'উলূম, দেওবন্দ,
১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

ঃ **তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ**
২য় খন্ড,
ইদারা–ই– ইহতিমাম দারুল উলূম, দেওবন্দ,
১৯৯৩।

যাফর হাসান আইবেক ঃ **আপবীতী**
মনসূর বুক হাউজ, লাহোর, ১৯৬৮।

রহিম, এম, এ ঃ **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস**
(৪র্থ সংস্করণ)
আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৪।

রুহুল আমীন, মোহাম্মদ ঃ **মুজাদ্দিদ–ই– আলফেসানীর সংস্কার আন্দোলন**
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪।

সারওয়ার, মুহাম্মদ, ঃ **খুতুবাত–এ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী**
সিন্ধ সাগর একাডেমী, লাহোর , ১৯৪৪।

হুসাইন আহমদ,মাদানী ঃ **নকশ্–এ হায়াত**
১ম খন্ড,
দারুল ইশা'আত, করাচী, তাঃ বিঃ।

ঃ **নকশ্-এ হায়াত**
২য় খন্ড,
মাকতবা–ই দীনিয়্যাহ , দেওবন্দ, ১৯৫৩।

ঃ **সফরনামা –এ আসীরে মাল্টা**
মাকতবাতিল ফাদলি, দেওবন্দ, তাঃ বিঃ।

হাবীবুর রহমান, মুহাম্মদ, মাওলানা ঃ **আমরা যাদের উত্তরসূরী**
আল-কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮।

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ **সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ**
২য় খন্ড,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
ঢাকা, ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

ঃ **বাংলা বিশ্বকোষ**
১ম খন্ড,
ঢাকা, ১৯৭৩।

ঃ **বাংলা বিশ্বকোষ**
৪র্থ খন্ড,
ঢাকা, ১৯৭৩।

J. Rawlatt : Rawlatt Sedition Committee Report 1918,

Moin Shakir, ঃ Khilafat of partition.
Delhi 1983.

Naresh Kumer, Jain, (ed.) ঃ Muslims in India. A Biographical Dictionary (II)
Manohar Publicatios, New Delhi, 1983.

Sen, SP (ed) ঃ ঃ Dictionary of National Biography III
Institute of Historical Studies, Calcutta: 1974.

পত্র পত্রিকা

দৈনিক জমী'অত, দিল্লী ঃ ২৬ মার্চ ১৯৮০ সংখ্যা।

সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ঢাকা ঃ ৭ম বর্ষ ২৮, ২৯ সংখ্যা (৯ মার্চ ১৯৯৪)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা , ঢাকা ঃ ৩৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (জুলাই–সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮)

ঃ ৩৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৯)

ঃ ৪২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (অক্টোবর–ডিসেম্বর,২০০২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ঃ একবিংশ সংখ্যা , ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫।